আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার ষট্‌পঞ্চাশৎ গ্রন্থ

গৃহদেবী

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ কলিকাতা

আশ্বিন—১৩২৯

প্রকাশক—শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

স্বদেশ ও সাহিত্যানুরাগী

শ্রদ্ধেয় সুহৃৎ—

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়

করকমলেষু।

গৃহদেবী

এক

—:*:—

আলো এবং বাতাস, স্বাস্থ্য ও প্রাণ কলকাতা সহরের অন্য অনেক স্থানে বেশ ঘোরালো হ'য়ে থাক্‌লেও এই বাড়ীটির ত্রিসীমানার মধ্যে এসেও যে তারা কোনদিন হাঁপিয়ে মরে নি—এটিকে দেখলে বোঝবার পক্ষে এতটুকু অস্পষ্টতাও থাক্‌ত না—যতকাল ধ'রে সে তার জীর্ণ অস্থিপঞ্জরগুলি দুর্ভিক্ষ-ম্যালেরিয়ার গ্রাস থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে, ততকালের একটা ইতিহাস এই যে, একটি বিধবা তার মধ্যে বাস করতেন, আর একটি বিধবা যেন কাছে দাঁড়িয়ে নীরবে সেটিকে, শুধু ভোগ করতেন। ঘরে-বাইরে সম-অবস্থা প্রায়ই দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, কিন্তু এখানে তার মণি-কাঞ্চন সংযোগ, ঘটেছিল। বাড়ীটির আশে-পাশে রায় বাহাদুর, পাল বাবু, হাঁসপাতালের বড় সার্জ্জন বাবু-সাহেবের বড় বড় বাড়ীগুলি এই হৃতালঙ্কারা বাড়ীটির দিকে ইলেকট্রিকের চোখ্‌ মেলে দেখ্‌ত—আর ভোগ করত। অন্য বাড়ীর অধিবাসীরা এটির দিকে চাইতেন না, এবাড়ীর যিনি অধীশ্বর তিনি এদেশে থাক্‌তেন না।

বিধবার একমাত্র পুত্র তরুণ মাদ্রাজের কোন্ একটি ক্ষুদ্র নগরোপকণ্ঠে এক স্কুলে লেখাপড়া করত, প্রাইভেটে একটা পাশ করে যেদিন প্রথম এসে সে এই পৈতৃক বাড়ীটার সাম্নে দাঁড়াল, ট্যাক্সি-ক্যাব থেকে নেমে—সে এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। পুরোণো ইঁট কাঠের মর্য্যাদা হয়ত কিছুই না হ'তে পারে—কিন্তু পিতৃপিতামহের বাসস্থান বলিয়াই তার মাথাটি চৌকাঠের উপরেই নত হ'য়ে পড়েছিল। ইহারও একটি কারণ হইতে পারে, সে এই জীর্ণ গৃহের সহিত আবাল্য সু-পরিচিত।

যেস্থান হইতে সে সেইমাত্র ফিরিয়াছে সেখানে রায় বাহাদুরের বাড়ার মত অভ্রভেদী চূড়া আকাশের সঙ্গে, মহা আস্ফালনে শির উন্নত করে দাঁড়িয়ে নেই, ছোট ছোট খড়ো ঘরগুলি দীন দরিদ্রের মত মাঠের মধ্যে থাকে-থাকে, যেন প্রকৃতির দ্বারে ভিখারীর মতই কুণ্ঠিত হ'য়েছিল। বিরোধ বেঁধেছিল—অত সরু গলির মধ্যেও যে অশ্রান্ত কলরব দিনরাত্রি নির্ব্বিশেষে জেগে থাক্ত—তাহাতেই। গোল যে সেখানে ছিল না, এমন নয়—জলের মধ্যে মাছের দল কত কোলাহলই ত করে, ডাঙ্গায় ফেলিলে আছাড় বিছাড় করে—এ দু'য়ের পার্থক্য বুঝিতে তরুণের একটি মিনিটও দেরী হয় নাই।

পৃথিবীর নাকি তিনাংশই জল, জল যে প্রবল শক্তিতে তরুণকে অবগাহনে নিমন্ত্রণ করছিল, সে শুধু তরুণ কেন, তার জননী সত্যবতীরও অজ্ঞাত ছিল না। জলের মাছ ডাঙ্গায় তুলিবার জন্য যত কারণই বর্ত্তমান থাক্—মানুষের রসনার

আকর্ষণ যে সব-চেয়ে বলবান, তরুণ সেইদিন বুঝতে পেরেছিল যেদিন কর্পোরেশন ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট-ওয়ালারা বাড়ী সারাবার জন্যে খুব একচোট ধমক চমক করিয়া গিয়াছিল। পিছনের টান শিথিল না হইলেও মধ্যাকর্ষণ শক্তির বলেই এই বাড়ীর মাটি তাহাকে টানিয়া আপনার করিয়া লইতে কালক্ষেপ করিল না।

খড়ো ঘরের মিষ্ট বাতাস, মাঠের দুরন্ত শূন্যতা, ছেলেবেলার ছোট বড় সঙ্গীদের মধুর স্মৃতি পরিপূর্ণ হৃদয় মন লইয়া এই জীর্ণ-ঘরের শান্ত সংযত দেবীমূর্ত্তি দেখিল—সে অসাধারণ শুষ্ক উৎফুল্ল মুখখানি, সে-চোখের নির্ম্মম মোহ তাহার জীবনটিকে আগাগোড়া বদলাইয়া দিয়া গেল।

ঐই ভাঙ্গাঘরের কোণে সে স্বর্ণপ্রদীপটি অক্ষয় পলিতায় কে জাগাইয়া রাখিয়াছে—কে জানে, তরুণ সেই মৃদু আলোক-তলেই হৃদ্-রক্তে পলিতা সিক্ত করিতে সচেষ্ট হইল। দুঃখের সংসারে এই-যে ছবিটা দেখিয়া নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের ধারা তাহার দুঃখবন্ধুর পথেই ধাবিত হইয়াছিল—কারণটি সে তাহার মার মুখেই একদিন শুনিয়াছিল, বিধবার জীবন-প্রদীপ-পাত্রে তৈল ফুরাইয়া গিয়াছে এবং পৃথিবীর মধ্যে সে-ই একমাত্র শক্তিমান—যে সে প্রদীপে তৈল সিঞ্চন করিতে পারে।

দুঃখীর ছেলে দুঃখের সংসারে পা দিয়া শিহরিল না. বড় জোর মনে করিল—তাই ত এমন-টা হইয়াছে!

গৃহাধিষ্ঠাত্রী তাহারই ভরসায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সুদূর প্রবাসে কাটাইয়াছেন, তাহারই মঙ্গল কামনায় যে

নিদারুণ বিয়োগ ব্যথা বক্ষে চাপিয়াছেন—চোখের জলে পবিত্র করিয়া এমন একটি মহান্ গৌরবময় কাহিনী বর্ণনা করিয়াছিলেন, তরুণ যেন গল্পটা অসম্পূর্ণ মনে করিয়া চঞ্চল হইয়া পড়িল।

সত্যবতী তাঁহার মনের কথাটি লুকিয়া লইয়া বলিয়াছিলেন,—এর পর কেমন করে দেখব, তুই শেষ করতে পারিস তরুণ!—হাসির ছলেই সত্যবতী কথা কয়টি বলিয়াছিলেন, কিন্তু তরুণ তন্নিম্নে জননীর হৃদয়ের করুণ প্রতিচ্ছবি দেখিয়া সজীব হইয়া উঠিয়াছিল।

সত্যবতীর কামনা নিষ্ফল হয় নাই। মাইক্রস্কোপে সূক্ষ্ম জীবাণু দেখার মত দেখিয়া লইলেন—যে তাঁহার শঙ্কা দূর হইয়াছে। মাতাপুত্রের বিরহ পুত্র-হৃদয় দুর্ব্বল করে নাই, যথেষ্ট স্বাস্থ্য সঞ্চয় করিয়া ফিরিয়াছে। বহু রোগ ভোগের পর পুত্রের পুষ্টস্বাস্থ্য দেহ দেখিয়া মা'র মন কি করে—তাহা ত ভাষার মধ্য দিয়া প্রকাশ চেষ্টা এক-রকম,—তাই বা কেন, প্রবল রকমের ধৃষ্টতা।

যে মন এতকাল মুক্ত বায়ুতে পাখা খুলিয়া উড়িয়াছে, এই চারিদিক-ঘেরা খাঁচাটির ভিতরে আসিয়া কেন-যে সে অসুস্থতা বোধ করিল, তাহার কারণ সে-ই নির্দ্দেশ করিল—

যে এখন হইতে সত্যকারের জীবনের সে সাড়া পাইয়াছে। এই দেশেরই কোন বালক-কবিকে সাগর ডাক দিয়া ঘরের বাহিরে জলে টানিয়া ফেলিয়াছিল, তরুণ যাহা স্থির করিল—শুদ্ধ বঙ্গভাষায় যাহাকে বলে—

"ঘুচাব মা তোর কালিমা আমরা, মানুষ আমরা নহি-ত মেষ।"

দুই

ছয় বৎসর পরে তরুণ গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে ঘামিয়া লালমুখে সেই গৃহের সদর দরজায় খট্ খট্ করিয়া কড়া নাড়িতেছিল, মা উপরের জানেলায় মুখ রাখিয়া বলিলেন—খোলা আছে তরুণ!

ভিতরে ঢুকিয়া খট্ করিয়া দরজাটি বন্ধ করিয়া দিতেই সত্য-বতী হাসি-হাসি মুখে আসিয়া বলিলেন—কেমন হ'ল বাবা?

তরুণ বুক পকেট হইতে কলমটি তুলিয়া টেবিলের উপর রাখিতে রাখিতে বলিল—বেশ হয়েছে।—বলিয়া সে প্রণাম করিল।

সত্যবতী একমুহূর্ত্ত পরে বলিলেন—চ'—উপরে! কি ঘেমেছিস্? হেঁটে এলি নাকি? কেন? পয়সা ত ছিল—তোর কাছে।

ছিল—খরচ হ'য়ে গেছে।

সত্যবতী হাসিয়া বলিলেন—কিসে খরচ হ'ল আবার?

তরুণ নিকটে আসিয়া চুপে চুপে বলিল—গুরুদেব সি-আই-ই হয়েছেন—

সত্যবতী সানন্দে জিজ্ঞাসিলেন—কবে?

সেই ত হ'য়েছে মজা। হয়েছেন ত জুন মাসে। আমার কি ছাই কাগজ-পত্র কদিন পড়া' ছিল! আজ শুনেই একটা টেলিগ্রাফ করে দিলুম।

চ'—উপরে। ঐ নে গামছা, হাত পা ধুয়ে ফেল্।

তরুণ সত্যবতীর কটিবেষ্টন করিয়া কচি ছেলের মত বলিল—ধোব—এখন। তুমি উপরে চল।

উপরে আসিয়া সে এক-রকম জোর করিয়াই তাঁহাকে বসাইল। মাটিতে শুইয়া পড়িয়া কোলের উপর মাথা দিয়া বলিল—মা, গুরুদেব যদি রাগ করেন?

না, না—রাগ করবেন কেন?

হাঁ-মা, এসব তিনি পছন্দ করেন না। আমি ত দেখেছি মা, স্কুলে থাক্‌তে—ফ্রি স্কুল করে দেশের দশের উপকার করছেন বলে যে সব চিঠি আসত, তিনি হেসে আমাদের পড়তে দিতেন; আর বল্‌তেন এরা আমাকে সং না সাজিয়ে ছাড়ছে না। তাই আমার ভয় হ'চ্ছে মা—

সত্যবতী বলিলেন—জানিস-ই যদি, করলি কেন বাপু?

তাহার একটু ভয় হইতেছিল।

জীবন-যৌবনের ঠিক মধ্যপথে এক আঘাতে, তিনবৎসরের শিশু ছাড়া সব চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, জীবনের সেই দিনটিতে মান্দ্রাজীর আবাহনপত্র দেবতার আশীর্ব্বাদের মতই স্বর্গীয় স্বামীর পুণ্যবলে তাঁহার মন দিয়া হৃদয়ে পৌঁছিয়াছিল। যে মেঘ অকালে একবার স্তব্ধ অন্ধকারে বিশ্বজগৎ ঘেরিয়া ফেলিতেছিল, কোন্ অদৃশ্য শক্তিবলে তাহার স্থানে পরিপূর্ণ নীলিমা পরিব্যাপ্ত হইতেছে—কোন কারণেই সে নীলাকাশ যে মেঘাচ্ছন্ন হইতে পারে—ভাবা যেমন স্বতঃ কষ্টকর—তরুণের গুরুদেবের বিরক্তি ভয় সত্যবতীকে তেমনি আঘাত দিতেছিল।

যে-দু'চারটা আত্মীয় এ-দিকে ও-দিকে ছড়াইয়াছিল, পরমাত্মীয়ের মত আসিয়া এত অম্ল মধুর বর্ষণ করিয়া গিয়াছিলেন—মায়ের কাছ ছাড়া থাকিয়া অত ক্ষুদ্র শিশু যে কোন মতেই মানুষ হইয়া আসিতে পারিবে না বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথাও আজ মনে পড়িতেছিল।

তরুণ হঠাৎ দুরন্ত বালকের স্বরে বলিল—এস ত, সেই তর্কটা—

কাল রাত্রে একটা বাংলা বহির সমালোচনা সুরু হইয়াছিল, রাত্রাধিক্য বশতঃ শেষ হয় নাই। আজ সে উত্তমরূপে পরীক্ষা দিয়া আসিয়াছে; অতএব নিশ্চিন্ত চিত্তে সে তর্কে প্রবৃত্ত হইতে চাহিল।

সত্যবতী বস্ত্রাঞ্চলে তরুণের মুখটি মুছাইয়া দিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। তরুণ চিরদিনই বাগ্‌দেবতার অনুগ্রহ অবশ্য প্রাপ্যরূপেই পাইয়া আসিয়াছে, আজ এম্-এ পরীক্ষা দিয়া সে যে প্রথম শ্রেণীর নিশ্চিত-আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছে, সে-কথা বুঝিতে সত্যবতীর দেরী হয় নাই। নিরাশার কোন পীড়নই নাকি সেখানে ছিল না, তাই সত্যবতীর পরিপ্লুত হৃদয় শ্রান্ত পুত্রের পাশে বসিয়া তর্ক করিতে দ্বিধা করিল না।

মা হাসিয়া বলিলেন—সে তর্ক তুই কাগজওয়ালাদের সঙ্গে করগে যা। আমি বইয়ের ভালমন্দের কথা ত বলিনি। আমি বলছি কি, বাংলাদেশের কোন্ হিন্দু এ রকম রুচি পছন্দ করবে, তাই শুনি?

তরুণ তর্ক করিবে না ভাবিল, কিন্তু তাহার ভিতরে এমন একটা শক্তি আছে যাহা তাহাকে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে। সে বলিল—কিসে কুরুচি বল!

মা বলিলেন—গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত। এ যে মেয়েটা, কোথাও কিছু নেই, রাতদুপুরে——

তরুণ বলিল—অবস্থাটি তুমি বুঝে দেখত মা, তাহ'লে তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে যে তা করা ছাড়া উপায় ছিল না।

মা তীব্রস্বরে কহিল—ঢের উপায় ছিল। সে যদি কেরাসিনে পুড়ে মরত কারো কোন দুঃখ ছিল না।

তরুণ স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে সত্যবতীর হৃদয়-মনের উদারতার পরিচয়ই চিরদিন পাইয়া আসিয়াছে, তাহার ভিতরে যে কোন অংশটা অন্ধকার বা সঙ্কুচিত ছিল এমন কোন দিনই তাহার মনে লয় নাই। সত্যবতী লেখাপড়া বেশী জানিতেন না, তরুণ আশ্চর্য্য হইয়া যাইত তাঁহার মনের কথাটি চিরদিনই তাহার সহিত মিলিয়া যায়। বিশ্বসাহিত্যের ও সমাজের ধার দিয়াও তিনি চলেন নাই, কিন্তু এ-ত তরুণ দেখিয়াছে যে তিনি যখনই কিছু বলিয়াছেন, সমস্তই যুক্তিসঙ্গত। তরুণ বরাবর কলেজ হইতে বাঙ্গলা মাসিক পত্রাদি আনিয়া দিত; দু'জনে পড়িয়া একসঙ্গে তর্ক করিতেন।

আজ তরুণ বিস্মিত হইয়া গেল। বলিবার তাহার অনেক কথা ছিল; যে চরিত্র সম্বন্ধে এই মাত্র সত্যবতী মত প্রকাশ করিলেন; তাহার স্বপক্ষে অনেক কথা সে বলিতে পারিত কিন্তু

বঙ্গরমণীর সতীধর্ম্মের ব্যত্যয় যে সত্যবতী কোনমতেই অনুমোদন করিবেন না, তাহা সেও জানিত। সেন্টিমেণ্টের দিক দিয়া আলোচ্য রমণীর চরিত্র চমৎকার ফুটিয়া উঠিলেও এই সতীত্ব বিসর্জ্জনের অপরাধটি যে কোন রমণীর কাছেই উপেক্ষনীয় হইবে না, তাহা কি সে জানে না!

সে আর তর্ক করিল না; একেবারে বলিয়া উঠিল—একবার বেড়িয়ে আসবার ইচ্ছে হ'চ্ছিল, মা।

সত্যবতী প্রসন্নমুখে বলিল—কোথায়? ভেলুপটাম?

তরুণ হাসিয়া বলিল—শুধু ভেলুপটাম নয়। একবার কাশী যেতে ইচ্ছে হয়।

তা যা না!—বলিয়া সত্যবতী পুত্রের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

তরুণ কথা কহিল না। সে-ত জানে, ইচ্ছার প্রতিকূলে কত কথাই না আছে, অর্থাভাবটি সব চেয়ে প্রবল। সত্যবতী তাহা বুঝিলেন, বলিলেন—দু'শ টাকা আমি তোকে দিতে পারি।

কোত্থেকে? গয়না বেচে?

না, না—তিনশ' টাকা আমার আছে।

কোথায় পেলে?

এই দেখ্—বলিয়া সত্যবতী হাসিয়া একটি কাঠের আলমারী খুলিয়া একখানি ছোট খাতা তরুণের হাতে দিলেন।

খাতাটির উপর লেখা ছিল—দুধের হিসাব!

এ-যে বাবার হাতের লেখা মা!

হ্যাঁ। একটু থামিয়া পুনরায় বলিলেন—ওর পেছনটায় দেখ্ না—হিসেব করা আছে।

তরুণ খাতাখানি খুলিয়া দেখিতে লাগিল। সত্যবতী পুত্রের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। দুই তিন মিনিট পরে তরুণ বলিয়া উঠিল—কি করে জমালে মা, আশ্চর্য্য ত!

তরুণ টিউশনি করিয়া যে অর্থোপার্জ্জন করিত, তাহা হইতে সংসার-খরচ করিয়াও সত্যবতী তিনশত টাকা জমাইয়াছেন। সংসার-খরচ, কলেজের মাহিনা সব একদিকে লেখা আছে। প্রতিমাসে আয়-ব্যয় জায় করিয়া জমাটি কোণে ফেলা। কোন মাসে দশ, বিশ, চল্লিশ টাকাও জমিয়াছে, কোনমাসে কিছুই জমে নাই।

সত্যবতী বলিলেন—ইচ্ছে যখন হ'য়েছে, একবার ঘুরে আয়।

তরুণ একমুহূর্ত্ত পরে বলিল—আচ্ছা মা চল-না দু'জনে যাই।

সত্যবতী হাসিয়া বলিলেন—সে হ'বে পরে। তার জন্যে তাড়াতাড়ি নেই। তুই কিছুদিন ঘুরে আয়।

তরুণ বলিতে গেল—না মা, ঐ ত পুঁজি——

সত্যবতীর মন বলিল—পুঁজি তাঁহার অত অল্প নহে—যাহার তরুণ আছে, পুঁজির কি শেষ আছে তাহার?—মাতৃগর্ব্ব যেন সস্নেহে দু'টি নেত্রে ক্ষরিয়া পড়িতেছিল। কিন্তু এ ভাবান্তর পুত্রকে জানিতে না দিয়াই বলিলেন—তা হোক্। আমি বল্‌ছি—তুই যা।

তরুণ কি ভাবিয়া লইল, বলিল—তাই যাই। বেশীদিন ত থাকা হ'বে না। দিন পনেরো কুড়ি। কি বল মা?

সত্যবতী হাসিলেন কিছু বলিলেন না।

তরুণ কুঁজা হইতে জল ঢালিয়া মুখ প্রক্ষালন করিয়া শরবৎপান করিয়া ফেলিল। পরে মা'র পায়ের কাছে বসিয়া যাত্রার পরামর্শ করিতে লাগিয়া গেল।

তিন

একদিন পরেই তরুণ একটি ছোট ট্রাঙ্ক মুটের মাথায় চাপাইয়া দিয়া ancestral homeএর নিকট বিদায় লইল। সত্যবতী দ্বারটি ফাঁক করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তরুণ নামিতে নামিতে বলিল—পৌঁছেই চিঠি দেব মা।—বলিয়া সে মুটের সঙ্গে চলিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া একখানি মধ্য শ্রেণীর কাশীর টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। গাড়ীখানি দিল্লী এক্সপ্রেস্,—খুব ভিড় হইয়াছে, তরুণ কোনগতিকে ট্রাঙ্কটি বেঞ্চের নীচে রাখিয়া একটু স্থান করিয়া লইল। বসিতেই যে জিনিষটা তাহার প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, সেটি এই—

সামনের একখানি বেঞ্চে একটি ছোকরা মাড়োয়ারী চোখে চশমা, গলায় মোটা চেনহার, গায়ে গরদের পাঞ্জাবী পরিয়া সিগারেট-ধূম পান করিতেছে, আর মাঝে মাঝে একটি বাঙ্গালী যুবতীর সহিত হাস্যালাপ করিতেছে। মেয়েটি প্ল্যাটফরমের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া একটা আধটা উত্তর দিতেছে মাত্র।

কিন্তু এ লইয়া মনে মনে আলোচনা করিবার স্পৃহা তাহার ছিল না, সে অতিকষ্টে অনেকের বিরক্তি উৎপাদন করিয়া ট্রাঙ্কটি খুলিয়া একখানি বহি বাহির করিয়া পড়িতে বসিয়া গেল। গাড়ীটি ছাড়িতেই যে যতটুকু পারে স্থান অধিকার করিয়া অধিকারের মাত্রা পূর্ণ করিতে একটু আধটু কাৎ হইয়া পড়িল। সকলেরই চেষ্টা আগে কাৎ হইতে পারিলেই মঙ্গল। তরুণের পাশের লোকটিও কাৎ হইয়াই ছিল, ক্রমশঃ ঢুলিতে ঢুলিতে একেবারে তরুণের কোলে মাথা দিয়া শুইয়া পড়িল। একে বহিটা সে-সময় ভারি জমিয়া উঠিয়াছে, এই উপদ্রবে তরুণ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। একবার একটা উৎকট দৃষ্টিতে লোকটার দিকে চাহিয়া আবার গ্রন্থে মন দিল। লোকটির শিথিল মস্তক আবার হেলিয়া পড়িল।

কি করিবে ভাবিতে ভাবিতে যেই-মুখ তুলিয়াছে দেখিল, মাড়োয়ারীর সঙ্গিনী মেয়েটি এই দিকেই চাহিয়া আছে। এক নিমিষের জন্য তরুণ তার যৌবন-সুন্দর মুখখানি দেখিয়া, লোকটার মাথা নামাইয়া দিয়া উঠিয়া পড়িল। বাঙ্কের উপর একটা লোক অর্দ্ধশায়িত ভাবে সামনের দিকেই চাহিয়াছিল, তাহাকে উঠিতে দেখিয়া টক্ করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। তরুণ বহিটা হাতে করিয়া দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

দ্বারপার্শ্বেই একটি বৃদ্ধ ঝিমাইতেছিলেন, হঠাৎ হাওয়া বন্ধ হওয়ায় ঘামিতে লাগিলেন। চক্ষু মেলিয়া বলিলেন—মশায়, হাওয়াটা ছেড়ে দিন।

দিই, বলিয়া তরুণ বৃদ্ধের ব্যাগ এবং পুঁটলিটি নীচে রাখিয়া বসিয়া পড়িল। বৃদ্ধ একেবারে শশব্যস্ত হইয়া বলিলেন—ম'শায় একজন আছেন এখানে——

মনে মনে হাসিয়া তরুণ দাঁড়াইয়া উঠিল। লজ্জাকর ব্যবহারটা বোধ করি বৃদ্ধের নিজের কাছেও ধরা পড়িয়া গিয়াছিল। কারণ পরমুহূর্ত্তেই তিনি বলিয়া উঠিলেন—কোথায় যাওয়া হ'বে?

তরুণ উত্তর দিল না; সে বহিটায় ডুবিয়াছিল, আর সামান্ত একটু পড়িলেই পরিচ্ছেদটা শেষ হইয়া যায়। কোন উত্তর না পাইয়া বৃদ্ধ অনধিকৃত স্থানটিতে ব্যাগ রাখিয়া তদুপরি দেহভার ন্যস্ত করিয়া কাশিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

তরুণ বহিটা শেষ করিয়া ট্রাঙ্কে তুলিয়া ফেলিল। জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দেখিল, যদি ষ্টেশনটির নাম পড়িতে পারে, কিন্তু শুধু কয়েকটা আলোই দেখা গেল। কিংকর্ত্তব্য—ভাবিতেছে, দেখিল সেই যুবতীটি নিদ্রালু মাড়োয়ারীকে ঠেলিতেছে। তরুণ মুখ ফিরাইয়া লইল।

তখনি শুনিল, মাড়োয়ারীটি বলিতেছে—আইয়ে, বাবু, বৈঠিয়ে!

তরুণ ফিরিতেই দেখিল, যুবক উঠিয়া বসিয়াছে, অনেকখানি স্থানও ছাড়িয়া দিয়াছে। বুঝিতে পারিল, মেয়েটি এই জন্যই তাহাকে ধাক্কা দিতেছিল।—এখনি মেয়েটার মুখের পানে চাহিয়া তাহার ঘৃণা হইয়াছিল, এখন অনেকখানি কমিয়া গেল।

নেহি—নেহি—

মাড়োয়ারী বলিল—উসমে ক্যা হায়? আপ খাড়া যায়েঙ্গে আর হামলোক সব শুতেগা? উহি ঠিক নেহি হ্যায়। আইয়ে।

তরুণ আসিয়া বসিল। মাড়োয়ারী হাসিয়া পকেট হইতে একটি লাল-বাতির ছবিওয়ালা সিগারেট বাক্স বাহির করিয়া বলিল—লিজিয়ে, সাব।

তরুণ বলিল—হাম নেহি পিতা হায়।

মাড়োয়ারীকে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিবে খুঁজিয়া পাইল না।

কাঁহা তক্ জানা হ্যায়?—ইত্যাদি ইত্যাদি।

কাশী। দশ পাঁচ রোজকা আস্তে—ইত্যাদি।

তরুণ দেখিল, মেয়েটি বরাবরই তাহাদের দিকে চাহিয়া আছে। সে ভাবিল—আজকাল পথে ঘাটে মাড়োয়ারীদের সঙ্গে বাঙ্গালী মেয়ে দেখা যায় কেন? আচ্ছা, মাড়োয়ারীরা কি বাঙ্গালীই পছন্দ করে? এ উহার কথা বুঝিবে না, ও উহার হাসিতে যোগ দিবে না—সে কেমন আমোদ!

আচ্ছা, এই-যে সব হিন্দুস্থানী বিয়ে করা একটা ম্যানিয়া জেগে উঠেছে—তারাই বা তা'তে কি সুখ পাচ্ছে? ইংরেজে বাঙ্গালীতে হ'চ্ছে না হয়—উভয়পক্ষই ইংরেজীতে সুশিক্ষিত—তাদের আটকায় না বটে, কিন্তু হিন্দুস্থানীর সঙ্গে হ'লে তারাও কি ইংরেজীতেই আলাপ করে?

দুই মিনিট ভাবিয়া লইয়া তরুণ দেওয়ালে মাথা রাখিয়া চক্ষু বুজিল, ট্রেনও বর্দ্ধমানে থামিল। মাড়োয়ারী পার্শ্ববর্ত্তিনীকে কি বলিল—তারপরই দ্বার খুলিয়া নামিয়া গেল।

হঠাৎ রুদ্ধ কক্ষের খোলা দ্বারে আলো-বাতাস যেমন একই সঙ্গে ঢুকিয়া পড়ে, গাড়ীতেও একেবারে হুড় হুড় দুড় দুড় করিয়া অনেক লোক ঢুকিয়া পড়িল। তরুণ চক্ষু খুলিয়া বলিয়া উঠিল—এই দেড়া, হ্যায় !

উতারো, উতারো।

এ টিকিস বাবু, এ ভাই—জমাদার—দেখোজী,——

যাও যাও ভাগো, তোমলোককা গাড়ী নেহি হায়—ইত্যাকার শব্দে গাড়ী একেবারে ভরিয়া উঠিল। যাহারা ঢুকিয়া পড়িয়াছিল কলরব করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল। তরুণ উঠিয়া দরজাটি বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মাড়োয়ারীটি চারদোনা পান এবং আর এক বাক্স [illegible] আনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—লিজিয়ে—

নেহি খাতা—বলিয়া তরুণ ফিরিয়া চাহিতেই মেয়েটির চোখ-দু'টি চোখে পড়িয়া গেল। চমৎকার চোখ-দু'টি ! হাঁ ও কি আর চমৎকার, তিনপুরু সুরমা, দু'ছোপ কাজল, খানিকটে ভেজলিন দিয়ে তৈরী !

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। সে বাহিরে মুখ রাখিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। হু হু করিয়া চুলগুলা বাতাসে উড়িতেছে, তরুণ চক্ষু মুদ্রিত করিল—ঘুম আসিতেছে—চাদরটি একটু গুটাইয়া মাথার নীচে দিয়া বাহিরে মুখ রাখিতেই দেখিল সেই মেয়েটি পিচ্ পিচ্ করিয়া পিচ ফেলিতেছে।

শুনিল, মাড়োয়ারীটি বলিতেছে—ক্যা, দোক্তা লাগ গৈ !

মেয়েটি কি জবাব দিল শুনা গেল না ; তরুণ ভাবিল কেন এ অধর্ম্ম করা ! বাঙ্গালীর মেয়ের কি অ-সব সহ্য হয় বাপু ? আচ্ছা ও মাড়োয়ারীটা না হয় বাঙ্গালী পছন্দই করিল, কিন্তু মেয়েটা কি বলিয়া আসিল ? হইয়াছে হইয়াছে—রজতখণ্ড !

সে ভাবিতেছিল—আচ্ছা, ও-কি বিবাহ করিয়াছে ! নিশ্চয়ই না। কিন্তু—হইতেও পারে। ঠিক বলা যায় না। দূর—একটু ঘুমোনো যাক্—ভাবিয়া সে মনকে সংযত করিয়া ফেলিল।

আর-একটা কি ষ্টেশনে গাড়ী থামিতেই অনেক লোক নামিতে মাঝের বেঞ্চটি খালি হইয়া গেল। তরুণ নিঃশব্দে বেঞ্চে শুইয়া পড়িয়া অন্যদিকে মুখ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

— ভোরের দিকে ঘুম ভাঙ্গিতেই দেখিল, মেয়েটি বসিয়া আছে, আর এক কোণে একটি মুসলমান বৃদ্ধ হাঁ করিয়া নিদ্রিত—মাড়োয়ারীকে দেখিল না। ভাবিল, কোন ষ্টেশনে নামিয়াছে বোধ করি ! পায়খানার দ্বারটি খোলা ছিল, তার মধ্যে কাহাকেও দেখা গেল না। সে উঠিয়া ট্রাঙ্কটি আছে কি-না দেখিয়া লইল ; তারপর ট্রাঙ্কটি খুলিয়া একখানি গামছা লইয়া পায়খানায় প্রবেশ করিল।

দু'তিন মিনিট পরেই ট্রেন একটা ষ্টেশনে থামিতেই দ্বারে করাঘাত হইতে লাগিল। তরুণ গামছা দিয়া হাতমুখ মুছিতেছিল, একটু হাসিয়া ছিটকিনী খুলিয়া দিতেই মেয়েটিকে দেখিতে পাইল।

মেয়েটি ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—একটা টেলিগ্রাপ করে দেবেন ?

কিসের টেলিগ্রাপ ?—বলিয়া তরুণ গামছাখানি পাট করিতে লাগিল। মুসলমানটি তখনও নিদ্রিত।

উনি বোধ হয় কোথায় নেমেছিলেন, আর উঠতে পারেন নি।

মাড়োয়ারীটা ? কোথায় নেমেছিল ?

তা জানিনে। সকালে উঠে আর তাঁকে দেখছিনে।

তরুণ এক মিনিট কি ভাবিল, দরজা খুলিতে খুলিতে বলিল—কি নাম তাঁর ?

বিরৈজমল বাবু।—বলিয়া মেয়েটি ক্ষুদ্র একটি বাক্স খুলিয়া দুইটি টাকা তরুণের হাতে দিল। তরুণ পাঁচ মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—দেখুন আগের ষ্টেশন দানাপুরে তার করে দিলাম।

এক যায়গায় মোটে ? মেয়েটির স্বর অত্যন্ত নৈরাশ্যব্যঞ্জক।

তরুণ বলিল—তার বেশী ত হ'ল না, বলিয়া সে দুইটি সিকি হাত বাড়াইয়া মেয়েটির সম্মুখে রাখিয়া দিল। মেয়েটি তাড়াতাড়ি একখানা দশ টাকার নোট তুলিয়া বলিল—আর দু' একটা জায়গায়——

তরুণের মনে হইল—মেয়েটি যেন কাঁদিবার উপক্রম করিতেছে। নোট-টা লইয়া সামনের তার-ঘরটিতে ঢুকিয়া পড়িল।

কোন টিশিন হায় ? করিয়া ধড়মড় উঠিয়া মুসলমান বৃদ্ধ বাহিরে মুখ বাহির করিয়া চেঁচাইতে লাগিল—এ-ভেইয়া কোন সেটিসিন ? দানাপুর ত নেহি আয়া ?

আজ হিঁয়াই উতার যাও, কাল তব্ দেখা যায়গা।

মুসলমান বৃদ্ধ কটমটু করিয়া চাহিয়া দুইহাতে বিছানা, বদনা ও জুতা লইয়া নামিয়া পড়িলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছিল, পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেলেন।

তরুণ দৌড়িয়া উঠিয়া মেয়েটির দিকে সোজাসুজি চাহিয়া বলিল—হ'য়ে গেছে।

চার

মেয়েটি অনেকক্ষণ আর কথা কহিল না। তরুণ পয়সায় রেজকীতে যাহা ফিরাইয়া দিয়াছিল, ছেঁড়া গদিটির উপরই পড়িয়া আছে।

তরুণ ভাবিতেছিল—মেয়েটি অন্ততঃ জিজ্ঞাসা করিবে যে কোথায় কোথায় তার করা হইল। কিন্তু কোন কথাই না শুনিয়া অধিকতর বিস্ময়বোধ করিল। ভাবিল—কি-রকম যেন ঠেকিতেছে। একটু ভাবিয়া জিজ্ঞাসিল,—কোথায় যাচ্ছিলেন আপনারা ?

কাশী।

একটু ভাবিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিল—সেখানেই থাকেন আপনারা ?

মেয়েটি নতমুখে পয়সা নাড়িতে নাড়িতে বলিল—না।

তরুণ প্রশ্ন করিতেছিল—বেড়াতে——

মেয়েটি বলিয়া উঠিল—টেলিগ্রাপের জবাব পাওয়া যাবে ত ?

যাবে বৈ কি ! একটু থামিল, আবার বলিল, অবশ্য যদি দেন !

মেয়েটি যেন ভাবিতে লাগিল—ঐ 'যদি দেন' কথাটা গলা দিয়া তাহারও বাহির হইয়া পড়িয়াছিল।

তাহার সেই সময়কার ভয়মিশ্রিত নৈরাশ্যের স্বরটুকু তরুণের কাণে বাজিল, একমিনিট পরে বলিল—আপনারা কলকাতাতেই থাকতেন?

হঠাৎ মেয়েটি জবাব দিতে পারিল না। একটু পরে বলিল—হ্যাঁ—ছিলাম।

এটুকুও তরুণের দৃষ্টি এড়াইল না, সে ধীরে ধীরে বলিল—দেখুন এ সব আমার জানা দরকার। এই ধরুণ বাঙ্গালীর মেয়ে আপনি, মাড়োয়ারীকে বিয়ে করেছেন—আপনি টপ করে স্বামীর নামটাই কয়ে ফেল্লেন—এতে কি কেউ দোষ দেবে আপনাকে? কেউ দেবে না।

মেয়েটি মাথা নিচু করিয়া বসিয়া রহিল, সাড়া দিল না।

তরুণ বলিল—দেখুন, খারাপ দিকটাও ভেবে নিতে হয়। আপনার স্বামী নিশ্চয়ই পরের ট্রেণেই এসে পড়বেন কিন্তু এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে, তিনি এলেন না। তখন বাঙ্গালী আপনি, আমিও তাই। আমাকে একটু কিছু করতে হ'বে আপনার জন্যে। তারপর, আপনার স্বামীকে আনাবার চেষ্টা——

আমার স্বামী ন'ন্—বলিয়া মেয়েটি একটু নড়িয়া বসিল।

তরুণ এমনই ঠিক যেন মনে করিয়াছিল। তাহা হইলেও একেবারেই হাঁ না বলিল না।

আর একটা ষ্টেশনে ট্রেণ থামিল; মেয়েটি বাহিরে চাহিয়া

রহিল। তরুণও টুক্ করিয়া নামিয়া পড়িয়া সামনের ষ্টেশনে ঘরটিতে ঢুকিয়া তারের খবর জিজ্ঞাসিল। কোন জবাবই আসে নাই শুনিয়া তরুণ দুঃখিতান্তঃকরণে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু পূর্ব্বের অনুপাতে উৎকণ্ঠা ও সহানুভূতি বহু অংশে কমিয়া গিয়াছিল।

মেয়েটি জিজ্ঞাসিল—খবর এসেছে ?

তরুণ সংক্ষেপে জবাব দিল—না। ঘরে না ঢুকিয়াই বলিল—আমার ট্রাঙ্কটা রইল এখানে, আমি পাশের গাড়ীটাতেই আছি।

মেয়েটি চকিতদৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—না—এই খানেই আসুন।

তরুণ বলিল,—দিনের বেলা, ভয় কি আপনার! আর বেশীক্ষণ ত নেই, আমি কি ষ্টেশনে নেমে খবর নেব।

মেয়েটি কিছুই বলিল না, কিন্তু তাহার কাতর দৃষ্টিটা তরুণকে আবার নত করিয়া ফেলিল। সে কি বলিতে যাইবে মেয়েটি বলিল—গাড়ী ছেড়ে দিলে যে, উঠে পড়ুন।

তরুণ উঠিয়া পড়িল, ট্রাঙ্ক হইতে আর একখানি বহি বাহির করিয়া লইয়া অনন্যমনে পড়িতে বসিয়া গেল। এমন অবস্থায় পড়া হয় কি হয় না এবং সম্ভব কি-না তাহা আমি জানি না, তরুণ বহিটা খুলিয়া বসিল।

বহির ছাপার অক্ষরগুলি ইংরেজী, কিন্তু তরুণের দৃষ্টির সমক্ষে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল—সেই বাঙ্গালী নির্লজ্জার কাতর মুখখানি। তাহারই মুখের বাঙ্গালা কথাগুলি! মনের ভিতর তন্ন তন্ন করিয়া খুজিয়াও এতটুকু ঘৃণা বা বিরক্তি দেখিতে পাইল না। তবে

কোন্‌খানটায় যেন একটি অল্পস্থায়ী ব্যথা জমিয়া আছে বলিয়া মনে হইতেছিল। সেটি বোধ করি মেয়েটির নির্বান্ধব অবস্থা স্মরণ করিয়া!

আস্তে আস্তে মুখটি তুলিয়া দেখিল, মেয়েটি বাহিরে রৌদ্র ঝলকিত প্রান্তরের পানে চাহিয়া আছে। একমুহূর্ত্ত পরেই সে-ও বইটা রাখিয়া দিয়া বাহিরের দৃশ্যটাই দেখিতে লাগিল। নিজের মনেই বলিয়া উঠিল— এযে বাংলা দেশের বাইরে আসা গেছে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। এ-ও মাঠ, সে-ও মাঠ! কিন্তু কত তফাৎ!— বাইশ বছরের যুবকের কাছে স্বদেশের গরিমা অল্প মধুর নহে।

সে ভাবিতেছিল—বাঙ্গালীর চোখে কি আর এ-সব লাগে! বাঙ্গালাদেশের মাঠের পানে চাইলে চোখ্‌ স্নিগ্ধ হ'য়ে যায়. আর এ-যেন একটা বুড়ো গরু, পিঁজরেপোলে গিয়ে নেহাইৎ ধর্ম্মভেবে একটু আধটু নড়ে চড়ে কাজ কর্ম্ম করে বেড়াচ্ছে; দুধ দিচ্ছে!

এই যেমন এঁরা! দয়া করে' বাঙ্গালী আর পছন্দ করেন না!—কি হল আপনার। চোখে কয়লা পড়েছে বু? আহা-হা, করছেন কি, করছেন কি! অত রগড়াবেন্‌ না। যান্‌ সোজা সুজি ঐ স্নানঘরে গিয়ে চোখটা ধুয়ে ফেলুন।

মেয়েটি আস্তে আস্তে উঠিয়া স্নানঘরে ঢুকিয়া গেল। তরুণ ভাবিতেছিল—দেখে শুনে খারাপও ত বোধ হয় না ওকে! না, না, ও হ'চ্ছে স্পিরিটের বোতল, ভেতরে বেশ টল টল করছে বোধ হয়——

মেয়েটি আসিয়া বলিল—মোগলসরাই খুব বড় ষ্টেশন ত? সেখানে গাড়ী কতক্ষণ থাম্‌বে?

তরুণ টাইম-টেবল দেখিয়া বলিল—গাড়ী বদলাতে হ'বে। প্রায় এক ঘণ্টা পরে অন্য গাড়ী।

মেয়েটি আর কিছু বলিল না। বেঞ্চের উপর পা দু'টি তুলিয়া বসনাবৃত করিয়া বসিল। প্রায় তিন চার মিনিট পরে জিজ্ঞাসিল, সেখানে জবাব আসতে পারে—স্বর অতীব নৈরাশ্যব্যঞ্জক।

পারে বৈ-কি।

এক মিনিট পরে মেয়েটি ক্লিষ্টস্বরে কহিল, যদি সেখানেও না আসে?

তরুণ হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। ইহা যে বাস্তবিক একটা ভাবিবার কথা ইহা তাহার মনেই হয় নাই। হঠাৎ তাহার কথা শুনিয়া সে বিস্ময়াভিভূতের মত বলিয়া উঠিল—তাই ত! একটু পরে বলিল—দেখুন, কাশী ত আপনি আগেও গেছেন?

মেয়েটি সংক্ষেপে বলিল—না।

আর যান নি? চেনাশুনো লোক আপনার কেউ নেই সেখানে?

মেয়েটি আবার বলিল—না।—বলিয়া সে করুণার্দ্র নেত্রদ্বয় নামাইয়া লইল। তরুণের চোখে সে'টি পড়িয়াছিল। যাহার সহিত এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে কোন সহানুভূতি নাই বলিয়াই তাহার প্রতীতি জন্মিয়াছিল, এই মুহূর্ত্তে তাহার দুইটি সকরুণ চোখের ভয়মিশ্রিত ব্যাকুলতা দেখিয়া সে একটু চঞ্চল হইয়া পড়িল। কিন্তু এক মুহূর্ত্তপরেই বলিয়া উঠিল—যেখান থেকে এসেছেন, তাহ'লে সেইখানেই যেতে হয়।

মেয়েটি জবাব দিল না।

তরুণ বলিল—অবশ্য মোগলসরাই ত আর বেশী দূরের পথ নয়, আধ ঘণ্টার মধ্যেই এসে যাবে। সেখানে টেলিগ্রাফের জবাব আসে, ভালই; যদি না আসে—সে-যেন একটু ইতস্ততঃ করিতেছিল। মেয়েটি তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল—আর যদি না আসে?

তরুণ স্পষ্ট উত্তর দিল, বলিল—ফিরে যাবেন।

মেয়েটি কি ভাবিতে লাগিল। একটু পরে ধরা গলায় বলিল—যদি বলি ফেরবার আর উপায় নেই?—

তরুণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার এক একবার মনে হইতেছিল, প্রথম হইতেই ইহাকে এড়াইয়া চলা উচিত ছিল। সে হাতের বহিটার পাতা মুড়িতে মুড়িতে বলিল—তবে কি করবেন? কাশীই যাবেন? তাই—তাই! কাশীতে আপনাদের থাকবার জায়গার ত অভাব নেই।—বলিয়া সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। নহিলে মেয়েটির এই সময়কার রক্তহীন ফ্যাকাসে মুখখানা তাহার চোখে ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিত। যখন সে মুখ ফিরাইল, মেয়েটি বাহিরে চাহিয়াছিল।

তরুণ বলিল—তাই করবেন? কাশীতে থাকবেন?

এক ঝলক দমকা হাওয়ার মত মুখটি ফিরাইয়া বলিল—সেখানে কোথায় থাকব, কে আছে আমার?—বলিয়া আবার সে বাহিরে চাহিল। তাহার উষ্ণ কণ্ঠস্বরটি ততোধিক উত্তপ্ত-দৃষ্টি দেখিয়া তরুণ আশ্চর্য্য হইয়া গেল। একটুখানি ক্রোধও যে না জন্মিয়াছিল, তাহা নহে। বলিতে যাইতেছিল—কে আছে-না-আছে

আপনি জানেন। আমি তার কি খোঁজ রাখি—কিন্তু গলা হইতে স্বর বাহির হইবার পূর্ব্বেই মেয়েটি অশ্রুসিক্ত-মুখে ফিরিয়া বলিল—তাই থাকব, আপনিও ত কাশী যাচ্ছেন?

হাঁ না কিছু বলিবার পূর্ব্বে তরুণ এক মহা সমস্যায় পড়িয়া গেল। যদি সে বলে, হাঁ—মেয়েটি ত বলিতে পারে, আমি সঙ্গে যাইব। আবার যদি না বলে এই নিরাশ্রয়া বঙ্গললনাই বা একেলা যাইবে কি করিয়া?—এক মিনিট ভাবিয়া লইয়া সে তীক্ষ্ণস্বরে কহিল—আমি যাব কাশীতে। কিন্তু আপনার ত আর আমার সঙ্গে কিছু থাকা হ'বে না। বরং একটা কাজ আমি করতে পারি, কাশী ষ্টেশনে একটা গাড়ী ঠিক করে দেব আপনাকে। সে ঠিক যায়গায় আপনাকে পৌছে দেবে, কি বলেন?

মেয়েটি ফিরিল না। তরুণ জানিতেও পারিল না যে বাহিরের চলন্ত দৃশ্য তাহার চক্ষে একেবারে স্তব্ধ স্থবির হইয়া গিয়াছিল। সে ভাবিল, ট্রেণের হুড়-হুড় গড়্-গড় শব্দের মধ্যে সে বুঝি তাহার কথাগুলি শুনিতেই পায় নাই। একটু পরে স্পষ্ট গলায় থাক্ দিয়া বলিল—বুঝলেন? সেই আপনার পক্ষে সুবিধে!

কি সুবিধে?

এবার তরুণ মেয়েটির সজলমুখে অশ্রুর রেখাগুলি স্পষ্টই দেখিতে পাইল, কিন্তু সে বিচলিত হইল না, স্থিরভাবে বলিল—কাশীতে আপনাদের মত লোকের থাকবার জায়গার অভাব হবে না।

এক মিনিট পর্য্যন্ত কোন উত্তর আসিল না! হঠাৎ মেয়েটি দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া উবুড় হইয়া শুইয়া পড়িল। অশ্রুপূর্ণকণ্ঠে কহিল—কি ভেবেছেন আপনি আমাকে! নিমিষের জন্য মুখটি তুলিয়া পুনরায় নামাইয়া লইল, বলিল—আপনি জানেন না, আমি তা নই!

পাঁচ

তরুণ অনেকক্ষণ অবধি কোন কথা কহিতে পারিল না। মেয়েটী এই মাত্র যে আশ্বাস তাহাকে দিল, তাহার বিরুদ্ধ চিত্ত প্রবোধ ত মানিলই না, উত্তরোত্তর যেন কৌতূহল বাড়িয়া গেল; মনের মধ্যে আর একটা ভাবের উদয় হইয়াছিল,—মেয়েটিকে স্ত্রী বলিতেও তাহার দ্বিধা ছিল না। মেয়েটি তখনও উবুড় হইয়া পড়িয়াছিল, তরুণ কিছুক্ষণ ধরিয়া তাহার নত দেহের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল ভবে—কি এ! স্ত্রী নয়, স্বীকারই করিয়াছে; তবে কি!

'পান বিড়ির' শব্দে চমক ভাঙ্গিতেই সে দাঁড়াইয়া উঠিল, মেয়েটির দিকে চাহিতে চাহিতে নামিয়া ষ্টেশনের ঘরে গেল; কিন্তু কোন খবরই আসে নাই, বিশুষ্ক মুখে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, —এখানেও কোন খবর পাওয়া গেল না ত!

মেয়েটি উঠিল না, যেমন পড়িয়াছিল, তেমনি পড়িয়া রহিল। তরুণ অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিল, এ কি শোকের গভীরতা! সে ত ইহার কেহই নহে, স্বীকার করিতেছে, তাহারই জন্য এত শোক!

আবার ভাবিল—না এ শোক তাহার জন্য নহে! এ তাহার নিজের নিরুপায় অবস্থাটির মর্ম্মভেদী পরিকল্পনা! সত্যই ত! একি ভয়াবহ আবর্ত্তনের মধ্যে সে পড়িয়াছে।

কিন্তু তরুণের মনে আশা হইতেছিল, মাড়োয়ারী নিশ্চয়ই তারে খবর জানাইবে। তাহা হইলেই সব দিকে মঙ্গল। এক মিনিট দাঁড়াইয়া সে বলিয়া উঠিল—আমি পাশের গাড়ীটাতেই আছি, যদি দরকার হয় ডাক্‌বেন।

কোন সাড়া আসিল না। সে পুনরাবৃত্তি করিল, তথাপিও সাড়া না পাইয়া একটু বিচলিত হইয়া পড়িল—মেয়েটি মূর্চ্ছা যায় নাই ত!—কিন্তু সে ত অনাত্মীয় এক যুবতী স্ত্রীলোককে ঠেলিয়াও তুলিতে পারে না! একি অবস্থাসঙ্কটের মধ্যে সে পড়িল! এদিক ওদিকে সারা গাড়ীর চারিদিকে চাহিয়া-চাহিয়া সে যেন একটা উপায়ের অনুসন্ধান করিতেছিল। একবার ভাবিল দূর হক ছাই, এসব কি বিশ্রী ব্যাপার, চলিয়া যাই, আপনিই উঠিয়া বসিবে, আবার ভাবিল—না, এমন অবস্থায় ফেলিয়া যাওয়া হইতেই পারে না।

নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—দেখুন—

উত্তর মিলিল না। সে তখন নিরুপায় হইয়া মেয়েটির পিঠের উপর করাঘাত করিতে লাগিল, তাহাতেও কোন শব্দ না পাইয়া, তরুণ দুই হাতে টানিয়া তুলিতেই তাহার মাথাটি ঝুঁকিয়া পড়িল। গাড়ী ভীষণ বেগে ছুটিতেছে, ষ্টেশন হইলেও বা কাহারও সাহায্যের আশা করা যাইতে পারিত, কিন্তু এখন! হঠাৎ মনে

পড়িয়া গেল, এলারম্ সিগন্যালটা টানিয়া গাড়ী থামান যায়, এক হাতে বুকের মধ্যে মূর্চ্ছিতা যুবতীকে চাপিয়া ধরিয়া সে শিকল টানিতে গিয়া হাত ফিরাইয়া লইল।

তাহার মনে হইতেছিল, গাড়ী থামিবে নিশ্চয়ই! কিন্তু লোকজন আসিয়া পড়িয়া একটা মহা হৈ চৈ বাঁধাইয়া দিবে ত! সে কে এবং ইহার সহিত একগাড়ীতে কেন, হঠাৎ মূর্চ্ছা হওয়ার কারণ কি!—এই সকল প্রশ্নের কোন জবাব সে নিজেকেই দিতে পারিতেছে না, তা—অন্যকে কি দিবে! এই ভাবিয়া সে সযত্নে সবলে তাহাকে উঠাইয়া স্নানঘরে লইয়া গেল। সন্তর্পণে মাটিতে শোওয়াইয়া জলের কল-চাবিটা নাড়ানাড়ি করিতে, একবার ছিড়িক করিয়া একটু জল বাহির হইয়াই বন্ধ হইয়া গেল; অনেক টানাটানিতেও আর এক বিন্দু জল বাহির হইল না।

হঠাৎ মনে পড়িল, তাহার ট্রাঙ্কের ভিতর স্মেলিং সল্টের শিশিটা আছে, সেটির দ্বারা কোন কার্য্য হইতে পারে ভাবিয়া সে ট্রাঙ্ক হইতে সেটি বাহির করিয়া ঘন ঘন মূর্চ্ছিতার নাকে ধরিতে লাগিল। প্রায় পাঁচ মিনিট সময় কাটিয়া গেল, জ্ঞান না ফিরিয়া আসাতে তরুণের প্রতিমুহূর্ত্তেই ভয় হইতেছিল, অন্য কোন বিপদ ঘটিবে না ত! চিকিৎসাশাস্ত্রে তাহার বিন্দুমাত্র ব্যুৎপত্তি ছিল না, কি করিলে কি-হয় সে জানিতই না। একবার করিয়া নাকের কাছে শিশিটা ধরে, আর একবার বুকের উপর কান পাতিয়া শব্দ শুনিবার ব্যর্থ প্রয়াস করে।

শেষবারেও যখন এতটুকু আশা দেখিতে পাইল না, শিশিটা

ফেলিয়া দিয়া সে এলারম সিগন্যাল টানিতে উঠিয়া পড়িল। ঠিক সেই সময় নিদ্রোত্থিতের মত মেয়েটি চক্ষু মেলিয়া অল্প অল্প চাহিতে লাগিল।

তরুণ উৎফুল্লনয়নে তাহার দিকে চাহিতেই মেয়েটি আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল। এই সময়েই গাড়ীর গতিও কমিয়া আসিয়াছিল, তরুণ মুখ বাড়াইয়া ষ্টেশনটি বড় না ছোট দেখিবার চেষ্টা করিতেছে, অনেকগুলি লোক একসঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল—জয় বাবা বিশ্বনাথজীকি জয়। সঙ্গে সঙ্গেই মুটের দল গাড়ীর হাতল ধরিয়া হাঁকিতে লাগিল—মুঙ্গলসরাই! মু-ঙ্গ-ল সরাই। বাবু মুটে—

তরুণ ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, মেয়েটি উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া ত্রস্তে বসন বিন্যস্ত করিয়া বলিল—এটা কোন ষ্টেশন, মোগলসরাই?

হ্যাঁ, আপনি উঠ্তে পারবেন ত

পারব।—বলিয়া সে দাঁড়াইয়া উঠিল। তাহার পা দু'টি তখনও কাঁপিতেছিল, দেখিয়া তরুণ বলিয়া উঠিল—এ-গাড়ী এখানে আধঘণ্টা থাম্বে, আপনি তাড়াতাড়ি করবেন না, একটু পরে নামলেও চল্বে।

মুটেরা বাক্স টানাটানি সুরু করিয়াছিল, 'আভি নেহি' বলিয়া তাহাদের বিদায় দিয়া তরুণ বলিল—বেঞ্চটাতে বসুন, শিশিটা শুঁকুন।

মেয়েটি আস্তে আস্তে বলিল—টেলিগ্রাপ্—

ও:—তা যাচ্ছি আমি ;—খবর আনছি। আপনি বসুন—বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

মেয়েটি সেইখানে বসিয়া প্ল্যাটফরমের পানে চাহিয়া রহিল। কত লোক ছুটাছুটি করিতেছে, কত নর-নারী এখানে ওখানে দল বাঁধিয়া বসিয়া গিয়াছে। কত লোক জানেলার ধারে আসিয়া কত বারই না এদিকে চাহিয়া গিয়াছে, সে সকলের দিকে তাহার লক্ষ্যও নাই। উদ্দেশ্যহীন এবং লক্ষ্যহীন এই জীবন-তরীটি তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ সমুদ্রের এমন একটা স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, যেখান হইতে সীমাহারা তরঙ্গ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। মানুষের মন এমন একটা জিনিষ যে এমন অবস্থায় মধ্যপথে অসীমের মধ্যে থাকিতে পারে না। জীবনসমুদ্রে তরঙ্গাঘাতে তরী না ডুবিলেও একটা দিকে সে উদ্দেশ্যবিহীন হইলেও ছুটিয়া চলিবে। অদূরে প্ল্যাটফরমের উপর তরুণের শুষ্কমূর্ত্তি দেখিয়াই তাহার হৃৎকম্প হইতে লাগিল। টেলিগ্রাফের যে কোন জবাব আসে নাই, তাহার মুখ দেখিয়াই সে বুঝিতে পারিল।

বার বার যেমন তরুণ আসিয়া 'না' বলিয়াছে, এবারও তাহাই বলিল। বোধ করি এই না-টা এমন করিয়া কোনবারেই আঘাত করে নাই। তরুণ তাহা বুঝিয়া আর তাহাকে একটি কথাও বলিল না। যে অপরিচিত অনাত্মীয়ার ভার ঘাড়ে পড়ায় প্রতি মুহূর্ত্তেই সে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, এখন তাহাকে কিছু বলিতে তাহার দয়া হইতে লাগিল। তরুণ যখন জিজ্ঞাসিল সে নামিতে পারিবে কি না, সে মৃদু অথচ স্পষ্টস্বরে বলিল—পারব।

তরুণ মুটে ডাকিল। জিনিষ-পত্র তাহার মাথায় তুলিয়া দিয়া বলিল—আসুন।

মেয়েটি উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কি-যেন বলিবে এমনই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

তরুণও তাহা বুঝিয়াছিল, এই সব হাঙ্গামে তাহার চিত্তের স্থিরতা ছিল না, সে উন্মনাভাবেই বলিল—দাঁড়ালেন যে, আসুন।

মেয়েটি ছল ছল চোখে বলিল—কোথায় যাব, তরুণবাবু?

তরুণ সাশ্চর্য্যে তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিল—আমার নাম জানলেন কেমন করে আপনি?

মেয়েটি তাহার হাতের বাংলা বহিখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেই, তরুণ বহির মলাটটা খুলিয়া দেখিল, নিজের হাতেই সে বাংলায় নামটি লিখিয়া রাখিয়াছিল।

মেয়েটি বলিল—কোথায় যাব, তরুণবাবু? কে আছে আমার কাশীতে? কার কাছে থাক্‌ব আমি, একলা মেয়ে মানুষ...

মুটে হাঁকিল—বাবু প্যাসিঞ্জার ঘণ্টা হো গৈল।

আসুন, আসুন—বলিয়া সে অগ্রসর হইল। নামিবার সময় মেয়েটির পা দু'টি টলিয়া গেল, তরুণ তাড়াতাড়ি তাহার হাত ধরিয়া নামাইয়া লইল।

ছয়

'নেটিভ ফিমেলস্' ওয়েটিং রুমে তাহাকে বসাইয়া তরুণ পুনরায় তার-ঘরে গেল। যদি কোন তার আসে, কাশীর বাঙ্গালীটোলার পোষ্ট মাষ্টারের কেয়ারে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া

দিয়া আসিল। ফিরিতে ফিরিতে তাহার মনে হইল, মাড়োয়ারী নিশ্চয়ই পলাতক, নতুবা এতগুলি টেলিগ্রাফের একখানিও কি তাহার হস্তগত হইত না? কিন্তু তাহার প্রতিকূলেও অনেক যুক্তি তাহার মনে আসিয়াছিল, মেয়েটি সেই-যে গাড়ীতে ক্যাস-বাক্স খুলিয়া টাকা বাহির করিয়াছিল, সে সময়ে দুইটি বড় নোটের তাড়াও তাহার নজরে পড়িয়াছিল। সে-টাকা যে মাড়োয়ারীর, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই তাহার ছিল না।

গাড়ী তখনও আসিয়া পৌঁছে নাই। তরুণ এখানে ওখানে বেড়াইতে লাগিল। মেয়েটীর কাছে তাহার জানিবার অনেক ছিল; কিন্তু কেন সে জানে না, তাহার নিকটে যাইতেও কেমন একটা শঙ্কা হইতেছিল। মেয়েটির এই নিদারুণ বিপদের সময় যে একমাত্র সে ভিন্ন আর কেহ নাই এবং তাহারই মুখ চাহিয়া সে অটল বিশ্বাসে বসিয়া আছে, ইহা মনে করিতেও একটা অজানা আনন্দে তাহার মনটি প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু কুয়াসাবৃত অরুণের মতই ম্লান আলোকপাতে হৃদয়ের অন্ধকার ত দূর হইতেছিলই না, অধিকন্তু কুয়াসার মতই দিগ্বিদিক আবছায়া করিয়া ফেলিতেছিল।

সে ভাবিতেছিল—যতদূর বুঝা যাইতেছে, মেয়েটিকে কোন গতিকে ভুলাইয়া মেড়ুয়াবাদীটি আনিয়াছিল, মধ্যপথে এই বিপদটি ঘটিয়াছে। এ বিপদ যে তাহার স্বেচ্ছাকৃত নহে তাহা সে ধারণা করিতে পারিলেও, মেয়েটির অবিবেচনার সে সমর্থন করিতে পারিল না। কি প্রলোভনে সে একটা কাপড়বেচা হতভাগা

মাড়োয়ারীর সঙ্গে আসিল ? সে কি উহাকে বিবাহ করিবে বলিয়া আনিয়াছে ? ঠিক বুঝা যাইতেছে না।

তাহার মনে হইতেছিল, হিন্দুস্থানী না হয় বলিল, তোমায় এত্তা রূপেয়া দেগা, এত্তা গহনা দেগা, আও হামারা সাথ!—তাই বলিয়া বাঙ্গালীর মেয়ে, স্বজাতি, স্ববর্ণ ছাড়িয়া গেল কি না এমন একটা লোকের সঙ্গে, যে জানে শুধু কাপড় বেচতে, টাকা জমাতে, আর ভেইয়া ভেইয়া করিয়া ছুরী শানাইতে!

গাড়ী আসিতেই তরুণ মেয়েটিকে লইয়া একটি কম্পার্ট-মেণ্টে তুলিয়া দিয়া নিজে অন্য গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। এবার আর মেয়েটি প্রতিবাদ করিল না। করিলেও কোন কাজ হইত না। তরুণ কোনদিকে ভাবিয়া কিছু কুল কিনারা পাইতেছিল না। যদিও তখনও তাহার মনে লোকটির প্রত্যাগমনের আশা পূর্ণমাত্রায় জাগিয়াছিল, কিন্তু যতক্ষণ না আসে তাহাকে লইয়া সে কি করিবে, এবং কোথায় রাখিবে, প্রয়োজন হইলে কি বলিয়া পরিচয় দিবে ইহাই তাহার ভাবনা।

মনের মধ্যে এমন একটা জটিল সমস্যার সন্ধান সে কোনদিনই পায় নাই। আত্মীয় অনাত্মীয় স্ত্রীলোকের সঙ্গে কোনদিনই তাহার কোন পরিচয় ছিল না। সংসারে এই রমণী জাতিটার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ তাহার সত্যবতীকে লইয়া! চিরদিন পুঁথিগত বিদ্যায় স্ত্রীজাতিকে সে এমন একটা শ্রদ্ধার উচ্চাসনে বসাইয়া রাখিয়াছিল যে আজ সেই জাতিরই একটিকে অতি নিকটে পাইয়া তাহার হৃদয় উদ্বেগাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। যে জাতি এতদিন তাহার চক্ষে

কেবল মাত্র একটা পূজ্যার্হা দেবীমূর্ত্তিতেই পর্য্যবসিত ছিল, আজ যখন সে বিপন্ন অতিথের মত তাহার কাছে উন্মুখ হইয়া দাঁড়াইল, সে-না পারিল তাহাকে বিমুখ করিতে, না পারিল সেই পূজার আসনটিতে বসাইয়া হৃদয়-নিবদ্ধ পূজা দিতে!

দূরের জিনিষটা যেমন একটু রঙীন হইয়াই চোখের সামনে ফুটিয়া থাকে, কাছে পাইলে অনেক সময় হয়ত তাহার সৌন্দর্য্য পূরামাত্রায় চোখে লাগে না, লাগিলেও আধ-আলো আধ-অন্ধকারের মত ভাবাবেশটি থাকে না, সারাজীবন ধরিয়া তরুণ যে মূর্ত্তিটি কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল, আজ এই মেয়েটি যেন তাহার কল্পনার সমস্ত রং চং একেবারে একাকার করিয়া দিল।

পুলের উপর হইতে বেণীমাধবের ধ্বজা, কাশীর গঙ্গাতীরের লাগালাগি ঘরবাড়ীগুলি দেখিয়া যে মুহূর্ত্তে যাত্রীর দল চীৎকার করিয়া উঠিল, তরুণ তন্মুহূর্ত্তেই হঠাৎ যেন একটা খোঁচা খাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল! এখনি যে তাহাকে একটি অপূর্ব্ব-পরিচিত অনাত্মীয় স্ত্রীলোককে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইতে হইবে, মনে হইতেই সে একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িল। কিন্তু ভাবিবার সময় তাহার ছিল না, গাড়ী থামিতেই সে মেয়েটিকে ও তাহার দ্রব্যাদি নামাইয়া লইয়া একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

মেয়েটি গাড়ীতে বসিয়া জিজ্ঞাসিল—কোথায় যাওয়া হবে?

বাঙ্গালীটোলায়।—সে আর কিছু বলিতে পারিল না। হুড় হুড় করিয়া গাড়ী চলিতেছে, মাঝে মাঝে পাণ্ডার দল আক্রমণ

করিতেছিল, সে সমস্ত এড়াইয়া চকের ভিতরে প্রবেশ করিয়া তরুণ জিজ্ঞাসিল—আপনাকে কি বলব আমি ?

মেয়েটি বলিল—আমার নাম।

তাই জান্‌তে চাই। মিথ্যা বল্‌বেন না, তা'তে অপকার হ'বে, উপকার হ'বে না।

মেয়েটি বিবর্ণমুখে বলিয়া উঠিল—কেমন ক'রে জানলেন আমি মিথ্যে বল্‌ব ?

তরুণ বলিল—জানাজানি ত কিছু নেই। যে—

তাহাকে চুপ করিতে দেখিয়া মেয়েটি তাহার পানে চাহিয়া বলিল—দেখুন, আপনি যা বলছেন সে-যে আমি না-জানি, তা নয়। সে কথা বলে আপনি আমাকে বেশী কষ্ট আর কি দিতে পারবেন ?

একটু থামিয়া সে রাস্তার পানে চাহিয়া একটি একটি করিয়া বলিল—এ দুঃখ যে সহ্য করতে পেরেছে, আপনার দু'টো কড়া কথা কি আর তার সহ্য হ'বে না ? কি বলবেন বলুন না ?

তরুণ আহত পশুর মত খাড়া হইয়া উঠিল, আবার তখনি আত্মজয় করিয়া স্পষ্টস্বরে বলিল—বলবার কিছু নেই। আর আপনাকে দুঃখ দেবার জন্য আমার বলবার কোন দরকারই হ'বে না। দুঃখ আপনাকে অনেক পেতে হ'বে।

মেয়েটি কি বলিবে বলিয়া হাঁ করিতেছিল, সে সুযোগ না দিয়াই তরুণ পরুষকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—আরও দুঃখ এতক্ষণ পেতেন, যদি আমি না হ'য়ে আর কারো হাতে পড়তেন।—

তাহার কথা শেষ না হইতেই মেয়েটি তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—

আপনি আমাকে মাপ করুন।—সে চুপ করিল। যেন একটু বলসঞ্চয় করিয়া লইল। তারপর বলিল—আমাকে সেই জায়গাটিতেই পাঠিয়ে দিন। ঘরের বার যখন হ'য়েছি, বরাতে দুঃখ যে আছে তখন না বুঝলেও এখন বুঝেছি। আর সে'টা এমন করে আপনি বুঝিয়ে দিয়েছেন—যে ভুল হ'বে না।

তরুণ একটু লজ্জিত হইয়া উঠিল।

মেয়েটি বলিল—গাড়োয়ানকে বলে দিন—আমাকে সেইখানে নামিয়ে দেবে। আমার জন্য আপনি আর দুঃখ পাবেন না। তাই বলে দিন।

তরুণ হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

সাত

একটা গলির সম্মুখে গাড়ী থামাইয়া তরুণ নামিয়া পড়িল। তাহাকে নামিতে দেখিয়া মেয়েটি ভয়চকিতস্বরে কহিল—কোথা যাচ্ছেন ?

তরুণ তাহার উত্তর দিল না, ইচ্ছা করিয়াই দিল না। বয়সের ও সৌন্দর্য্যের যত মোহই থাক্—এবং প্রথমটা একটু রেখাপাত হইয়া থাকিলেও—এখন ঘৃণায় ও বিরক্তিতে তাহার মনটা কেমন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। শেষের কিছুক্ষণ সে অতি কষ্টেই গাড়ীতে বসিয়াছিল।

সে-যখন কোন উত্তর না দিয়াই চলিয়া গেল, প্রায় পনেরো মিনিট কাটিয়া গেলেও ফিরিয়া আসিল না দেখিয়া মেয়েটি

উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। গাড়ীর জানালার খড়খড়িগুলির অধিকাংশই ভাঙ্গা—সেখানে চক্ষু রাখিয়া সম্মুখেই দেখিল, একটি বেনের দোকান; এদিকের একটি রোয়াকে পথিকের দল মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিতেছে, সে'ও দেবীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল। ইচ্ছা হইতেছিল, নামিয়া দেবী দর্শন করিয়া আসে। কিন্তু কোথাকার আলস্যে হৃদয়টি ভরিয়া গিয়াছিল, নামা হইল না। কাশীর অনেক রকমের গল্প তাহার জানা ছিল। মানুষ যত বড় বিপদেই পড়ুক, ভাবে—বুঝি এর চেয়ে বিপদ আর নাই; জ্বরের রোগী যেমন জ্বরের কষ্টে অন্য রোগের কামনা করে; কেসো রোগী অন্য একটা চাহিয়া মরে, ভাবে সে'টা এত কষ্টদায়ক নহে নিশ্চয়ই—মেয়েটিও ভাবিয়াছিল, এমন বিপদে সে আর পড়ে নাই—ইহাপেক্ষা অন্য সবই নিরাপদ হইত, কিন্তু একটা সামান্য কথায় তাহার মন অন্যথা করিয়া ফেলিল। জ্বরো রোগীও খোস পাঁচড়ায় ভুগিয়া বলে—এর চেয়ে জ্বর যে ভাল ছিল।

সে ত যথেষ্ট বিপদেই পড়িয়াছে, একেবারে নিরাশ্রয়—এর চেয়ে হীনাবস্থা তাহার কি হইতে পারে—কাশীর রাজপথ ইহার চেয়ে ভয়ঙ্কর হইতে পারে না—মনে মনে স্থির জানিলেও আলস্য-হেতু নামিতেও তাহার মন অসম্মত হইয়া পড়িল।

একটি বৃদ্ধা একঘটি জল হাতে করিয়া আসিতেছিলেন, দেখিবার কিছুই ছিল না, মেয়েটি হাঁ করিয়া তাহাই দেখিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, সে যদি ঐ বুড়ীটির কাছেও একটা যেমন

তেমন আশ্রয় পায়—বাঁচিয়া যায়। বৃদ্ধা দেবী-চত্বরে প্রণাম করিয়া গাড়ীর সন্নিকটে আসিয়া মুখখানি তুলিয়া গাড়ীখানির খোলা খড়খড়ির ভিতর দুটি কালো তারা দেখিতে পাইয়া বলিলেন—কোথা থেকে আসছ গা বাছারা ?

তাহার উত্তর দিতে ইচ্ছা হইল, আশ্রয়ের চিন্তাটুকু তখনও মন হইতে বিদূরিত হয় নাই, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধ চিন্তাও জাগিয়াছিল, কথা কহিতে পারিল না।

বৃদ্ধা একটু বিরক্ত হইয়া মুখখানি বাঁকাইয়া বিড় বিড় করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই সে বলিল—কলকাতা থেকে।

বৃদ্ধা দাঁড়াইলেন, বলিলেন—বাড়ী খুঁজছ কি ? ক'দিন থাকা হ'বে ?—তিনি দরজাটি খুলিবার চেষ্টা করিতেই, কোচম্যান ঘোড়ার ঘাস হাতে তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া দিল। অনেকক্ষণ দেরী হওয়াতে সে বড়ই বিরক্ত হইয়াছিল—বৃদ্ধার সহিত হয়ত ইহারা যাইবে, বাবুটি পাঠাইয়াছেন এই আশাতেই সে দ্বারমুক্ত করিতে নামিয়াছিল।

ক'জন ? একেলা ? স্বোয়ামী সঙ্গে আছেন ত ?

কমলা বলিল—না।

বৃদ্ধা পাদান হইতে পা নামাইয়া লইলেন, বলিলেন—তোমরা ?

কায়স্থ।

বৃদ্ধা একটু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া জিজ্ঞাসিলেন—বিয়ে হয় নি ?

না।

কার সঙ্গে এসেছ বাছা ?

জানিনে।

এ পাড়ায় বাড়ী প্যবে না বাছা, সে ঐ ডালকিমুণ্ডীর দিকে যাও।—বলিয়া তিনি সশব্দে দ্বারটি বন্ধ করিয়া দিলেন। যে ঘৃণিত নামটির সঙ্গেই বৃদ্ধা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া উঠিলেন, মেয়েটি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঐ নামটির সহিত কোন দিনই পরিচিত ছিল না, কিন্তু এই মাত্র অন্য একটি লোকের কাছ হইতে এমনই একটা স্থানের পরিচয় পাইয়াছিল বলিয়া বুঝিতে পারিল।

বৃদ্ধা হঠাৎ ফিরিয়া বলিলেন—এখানে বৃথা চেষ্টা করা বাপু। হ্যাঁ, তোমার নামটি কি বাছা?

সে কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল, বৃদ্ধা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—তোমায় নামে আমার কাজ কি বলছ—কাজ কিছু নেই, তবে কি-না—

তবে কি-নাটা স্পষ্ট করিয়া বলা হইল না, একটা লোক কে আসিয়া হাঁ করিয়া একবার তাঁহার পানে একবার গাড়ীটির পানে চাহিয়া উঠিল।

মেয়েটি তাহা দেখিতে পায় নাই, সহজভাবেই বলিল—আমার নাম অম্বা।

বৃদ্ধা ঘটিটির জল মাথায় ছিটাইতে ছিটাইতে প্রস্থান করিলেন! তরুণ দ্বারটি খুলিয়া বলিল—আসুন!

অম্বা দ্বিরুক্তি করিতে পারিল না, গাত্রবসনটা একটু গুছাইয়া নামিয়া পড়িল। তরুণের সঙ্গে দুইটা মুটে ছিল, তরুণ বাক্স পেঁটরা তাহার মাথায় তুলিয়া দিতেছিল, অম্বা বলিল—ক্যাসবাক্সটা দিন।

তরুণ মুটের হাত হইতে ছোট বাক্সটি টানিয়া লইল।

দুই তিনটা গলি পার হইয়া যে বাড়ীটার অন্ধকার দ্বারের ভিতর দিয়া তাহারা ঢুকিল, অম্বার মনে হইতেছিল, বুঝি সেটা লোকালয় হইতেই পারে না। বলিয়া উঠিল—এই বাড়ী?

পুরুষ-হৃদয় তখন অনেকটা সংযত হইয়াছিল, তরুণ বলিল—ভয় নেই, ভেতরটা ভাল।

বাস্তবিক তাই, ভিতরে দিব্য একটি ত্রিতল-গৃহ। একটা খালি ঘরে ঢুকিয়া জিনিষপত্র নামাইয়া লইল। বলিল—দুটো ঘর নিয়েছি, এই একটা দোতলায়, একটা ছাদে।

অম্বা বলিল—কত ভাড়া হ'ল?

তরুণ বলিল—বেশী নয়—দশ।

একটু পরে বলিল—দু'তিন দিন ত অপেক্ষা করতেই হ'বে। যদি কোন খবর আসে—

অম্বা বাক্সটি খুলিয়া মুটেদের একটি সিকি দিল। তরুণ আপত্তি করিল না।

এখানে খবর পাওয়া যাবে?

তরুণ বলিল—আশা ত করি।

অম্বা মুখ হইতে কেমন বাহির হইয়া গেল—আর যদি না আসে—

তরুণ সহজ ভাবেই বলিল—তাহ'লেই মুস্কিল আর কি!

অম্বা চঞ্চল হইয়া বলিল—চলুন, তেতালাটা দেখে আসি।

তরুণ বলিল—চলুন না।—সে-যেন তাহার ভয়টা সমর্থনই

করিল। নিঃশব্দে অম্বাকে সঙ্গে লইয়া ছাদে আসিয়া বলিয়া উঠিল—দেখ্ছেন। কেমন চমৎকার না? ঐ গঙ্গা। এখানকার গঙ্গা দোটানা নয়, বুঝলেন, একটানা। ঐ দিকে চলেছে। পড়েন নি?

অম্বা বলিল—জোয়ার ভাঁটা নেই নাকি?

তরুণ ভাবিল—ইহারা কেবল জোয়ার ভাঁটারই খোঁজ করে। মুখে বলিল—তা ঠিক জানি নে। বোধ হয় একটানা যখন, জোয়ার ভাঁটা না থাকাই সম্ভব।

অম্বা আলিসার পার্শ্বেই দাঁড়াইয়াছিল, বলিল—জলটি তেমন পরিষ্কার নয়, আমাদের হাত্‌কান্দার—

তরুণ রহস্যচ্ছলে বলিল—চারুবাবুর জমিদার বাড়ীর হাত-কান্দা না-কি?

মেয়েটি তাহার পানে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চহিয়া বলিল—সে কি?

বাংলা উপন্যাস পড়েন নি?

অম্বা বলিল—পড়েছি।

কি কি পড়েছেন—বলুন ত?—রহস্যচ্ছলেই সে প্রশ্নটা করিয়াছিল, জবাব শুনিয়া 'থ' হইয়া গেল। অম্বা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল—ক'খানা আর পড়েছি বলুন!

তরুণ সবিস্ময়ে বলিল—আপনি রাগ করলেন না-কি!

সত্যবতীর চিরগম্ভীর মূর্ত্তিটিকে কোনদিন সে ক্রুদ্ধ বা ক্ষুব্ধ দেখিতে পায় নাই। সেই আদর্শই ছিল—তাহারই সম্মুখে, সে মূর্ত্তি যেমন সুন্দর তেমনি সংযত—নারীজাতির এই শান্ত সংযত

মূর্ত্তির অন্যথা সে কল্পনা করিতেও পারে না। বলিল—আপনি রাগ করলেন না-কি!

অম্বা বলিল—না, রাগ কিসের।

তরুণ কিন্তু তাহা বুঝিল না। সে বিনীতকণ্ঠে বলিল—রাগ করবার কথা আমি বলিনি, তবুও যদি…

মেয়েটি বলিল—না না—

তরুণ বলিল—শুধু দাঁড়িয়ে গল্প করলেই ত হ'বে না! খাবার দাবার একটু চেষ্টা করতে হ'বে ত! কি খাবেন—বলুন? না না, আপনি আবার কি বলবেন? আপনি এখানকার জানেনই বা কি! আমিই ঘুরে আসি।—

বলিয়া সে নামিয়া গেল।

আট

তরুণ চৌকাঠের সামনে বসিয়া পড়িয়া বলিল—কিছু না। কোন খবরই নেই।

অম্বা বিবর্ণমুখে বসিয়া রহিল। ঠিক এই মুহূর্ত্তে সে যেন নিজের অবস্থা ঠিক বুঝিতে পারিয়া শিহরিয়া উঠিল।

তরুণ আপন মনে বলিল—হাতকান্দাটা কোন জেলায়?

হুগলী জেলা। খামারগাছী পোষ্টাফিস।

তরুণ বলিল—কে আছে আপনার? তাঁর নামটি পেলে সব কথা খুলে একখানা চিঠি লিখে দিই।

অম্বা চুপ করিয়া রহিল। সে ভাবিতেছিল, তাহা ভিন্ন আর

কি উপায় আছে? আবার এ ভাবনাও হইতেছিল, কোন্ মুখে আবার সেই গৃহে মুখ দেখাইবে? কিন্তু তাহার তখন এমনি অবস্থা যে কালামুখ দেখাইতেও তাহার ভয় ছিল না।

বলিল—বাবাকে লিখবেন? তাঁর নাম হরকান্ত বসু।

তরুণ বলিল—আজই লিখে দিই। আচ্ছা—আপনি সুফলের আশা করেন?

অম্বা কথা কহিল না। তরুণ ভাবিল, প্রশ্ন করাটা ঠিক হয় নাই। কিন্তু সে তথ্যটা কত বড় প্রয়োজনীয়—তাহাও তাহার অজ্ঞাত ছিল না। একটু ভাবিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, কপালের ঘামটি মুছিয়া ফেলিতে ফেলিতে কহিল—যাই, একখানা চিঠি লিখে, ফেলে দিয়ে আসি।—যাবার সময় শুনিয়ে যাব—আপনাকে।

আমাকে শোনাবার দরকার নেই। আর শুনুন—

তরুণ ফিরিয়া চাহিতেই বলিল—ভেতরে আসুন-না। দেখুন, আপনি যখন কথা বলবার দরকার হ'বে কাছে এসে বল্‌বেন। ও-তে লোকের কি-রকম মনে হয়।—বলিয়া সে এদিক-ওদিক চাহিতে লাগিল।

তরুণ বলিতে যাইতেছিল যে; মনে করিবার মতই তো! কিন্তু বলিল না। ওষ্ঠ দংশন করিয়া বলিল—আচ্ছা।

একঘণ্টা পরে নামিয়া আসিয়া বলিল—নামটি কি বল্লেন ভুলে গেছি।

তাহাকে হাসিতে দেখিয়া অম্বার অধরকোণও প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল, স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, আমারই মত মনটি আপনার।

তরুণ সহাস্যে বলিল—আর বলেন কেন! আপনার এখানে ত দোয়াত কলমের নাম-গন্ধ নেই? যাই—পোষ্টাফিসে গিয়ে লিখে দেব'খন। কি বলেন?

সে কি বলিবে? তরুণ নামিয়া যাইতেই অম্বা চৌকাঠ ধরিয়া বসিয়া পড়িল। সেই স্থানেই কয়েকবিন্দু শুষ্ক জলের রেখা বৃত্তাকারে পড়িয়াছিল, ঝট্ করিয়া তরুণের ঘাম মুছাটি মনে পড়িয়া গেল। সে কি পরিশ্রমই না করিতেছে। রোজ দুইবার তিন-বার করিয়া পোষ্টাফিসে আনাগোনা করা, একটা না, কাশীর সব কটা ডাকঘরে সে যায়—যদি ভুলক্রমে বাঙ্গালীটোলায় না আসিয়া অন্য কোনটিতে খবর আসে! শুধু কি তাই? আজ পর্য্যন্ত একটি পয়সা তাহার নিকট হইতে লয় নাই।

কাল অম্বা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া ফেলিয়াছিল, টাকা যা খরচ হ'চ্ছে আমার কাছে নেবেন।

প্রথমাবধি তাহার কেমন ধারণা জন্মিয়াছিল—এই যুবকটির হৃদয় বলিয়া একটা যেমন দৃঢ় সম্পত্তি আছে—পয়সার স্থানটা ইহার কেমন শূন্য শূন্য! তাই সে অনেক চিন্তাদ্বন্দ্বের পর কথাটা বলিতে পারিয়াছিল।

তরুণ বলিয়াছিল—যতক্ষণ আছে, চলুক না।

অম্বা আর কিছুই বলে নাই। কেন জানি না, আর একটু শ্রদ্ধা বাড়িয়া গিয়াছিল।

তরুণ ভাবিয়াছিল—এ দু' তিন দিনের খরচ বৈ ত নয়—সে চলে যাবে একরকম করে। ওর টাকাটা না-ই বা নিলাম। ভারি ত।

তাহার নিজেরই আর্থিক অবস্থা যে কত শোচনীয় তাহা ত সে জানে; সামান্য-অপব্যয়ও যে কত কষ্টকর আজীবন ত দেখিয়া আসিয়াছে। সে তাই অম্লানমুখে সহ্য করিয়া যাইতেছে, অন্য কেহ হইলে হয়ত পারিত না—এই গর্ব্বের বিশ্বাসটি অতি সঙ্গোপনে তাহার শিক্ষিত অন্তঃকরণের একটি কোণে ফুটিয়া থাকিত।

সে ফিরিতেই অম্বা বলিল—জবাব আসবে মনে হয়?

প্রশ্ন যেন সে আপনাকেই করিয়াছিল, তখনই চিন্তিতমুখে বলিল—আসবে—নিশ্চয়।

তরুণ একটু পরে বলিল—দেখুন আজ আমার ফিরতে একটু দেরী হ'বে।

অম্বা ত্রস্তভাবে জিজ্ঞাসিল—কোথায় যাবেন?

তরুণ বলিল—সিকরোলে যাব একবার। আমার গুরুদেব—

আপনি দীক্ষা নিয়েছেন না-কি?

না, না—সে হয় নি। আমি ছেলেবেলায় এক গুরুগৃহে লেখাপড়া শিখেছিলুম, তাঁকেই গুরুদেব বলি। সেই গুরুদেব সিকরোলের দিকে একটা জমি কিনে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করবেন—তাই দেখতে যাচ্ছি।

অম্বা হাসিয়া বলিল—আশ্রম?

তরুণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—গুরুগৃহকে লোকে আশ্রম বলে থাকে।

অম্বা বিষণ্ণমুখে বলিল—এই দেখুন, রাগ কার বেশী? সেদিন আমাকে না বলছিলেন……

তরুণ বলিয়া উঠিল—থাক্ সে তর্ক। আপনি যথাসময়ে আহারাদি করে শুয়ে পড়বেন, বুঝলেন? কৈশুয়ার মা ত রাত্রে থাকে।

অম্বা কথা কহিল না। প্রথমটা একটু ভয় হইয়াছিল বৈ কি, কিন্তু স্থায়ী হয় নাই। এত বড় বাড়ীতে, এত লোকজন—ভয় কি! ক্রমশঃ রাত যখন ১০টা বাজিয়া গেল—দিবসের অক্লান্ত প্রচণ্ড জনকোলাহল জীর্ণ গৃহখানির মতই পরিত্যাগ করিল,—কেশুয়ার মা তাহাকে 'আগুলিতে' বারবার শপথ করিয়াও শপথের সম্মান রক্ষা করিতে সক্ষম হইল না, তখন সত্য সত্যই তাহার ভয় হইল। কিন্তু ভয় যে কেন—কিসের জন্য তাহা সে অনুধাবন করিতে পারিল না। বাড়ীওয়ালা বাবুদের ছেলেটি পড়া মুখস্থ করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িল এবং এগারোটা বাজে বলিয়া তাহার জননী পুত্রের কক্ষদ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন—অম্বা আর কোন মতেই বসিয়া থাকিতে পারিল না। সেই পুত্রের জননীর নিকটে গিয়া যা-তা একটা কথা বলিয়া ফেলিল।

দরজা অমনি ভেজান থাকবে?

তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন—কিচ্ছু ভয় নেই মা। বাবা বিশ্বনাথের রাজত্ব এ, বলে স্বর্ণ-কাশী। মহাদেবের ত্রিশূলে অবস্থান করছেন।

প্রশ্নকারিণী ভাবিতেছিল, এমন অনধিকার চর্চ্চা সে করিতে আসিল কেন? তখনই মনে হইল, সে ত অনধিকার চর্চ্চা করিতে আসে নাই।

বয়স্কা মহিলাও সেইরূপ আন্দাজ করিয়াই বলিলেন—ছেলে ত ফেরেন নি ?

অম্বা মুখ তুলিয়া বলিল—কে ?

আমাদের ছেলে গো—

না।—বলিয়া অম্বা মুখ নত করিয়া লইল। মহিলা 'কোন ভয় নেই, নিশ্চিন্তি হ'য়ে ঘুমোও' মা—ইত্যাকার অভয় উপদেশ দিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলেন। অম্বা দুই পা অগ্রসর হইয়া বলিল—সদর দরজায় লোক থাকে ত ?

থাকে গো থাকে।—একটু হাসিয়া বলিলেন—কিন্তু বেশ ঝিটি ছেলে আমার খুঁজে এনেছেন। কাজ ত করেন কত, ঘুমিয়েই পুষিয়ে নেন্।

কেশুয়ার মা'র কার্য্যে সূক্ষ্মতা এবং বচনে দীর্ঘতার কথা অম্বাও জানিত, একটুখানি হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ।

শুয়ে পড়গে বৌমা, ছেলে এলেই ভজুয়া দোর খুলে দেবে'খন —বলিয়া তিনি খুট্ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। অম্বা নিজের ঘরটিতে ঢুকিতেছিল, তরুণ বলিল—জেগে আছেন ?

তাহার স্বরে বা ভাবে এতটুকু উদ্বেগ বা বিস্ময় রহিল না। তাহার জাগিয়া থাকাই যেন একমাত্র স্বাভাবিক—এই মতটুকু ঐ তিনটি কথার মধ্যে প্রকাশ করিল। অম্বাও সেটুকু লক্ষ্য করিয়াছিল। যদিও সে রাজা ডাকাত, ভীল সর্দ্দারের মেয়ে প্রভৃতি নামধেয় কোন একটা স্থান বিশেষ হইতে প্রকাশিত কয়েকখানি উচ্চ প্রশংসিত এবং জয়শ্রীমণ্ডিত উপন্যাস পাঠ করিয়াছিল—

তাহাতে এরকম কোন চরিত্র তাহার চক্ষে পড়ে নাই। তবুও তরুণের এই ব্যবহারে সে আর কিছুমাত্র বিচলিত হইল না, কারণ সে বিগত কয়টি দিনেই এই যুবকের চরিত্রের যতটুকু মাধুর্য্য, যতটুকু সৌন্দর্য্য সবটুকু নিঃশেষ আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছিল।

সে স্বাভাবিক সহজ কণ্ঠেই বলিল—হ্যাঁ জেগেই ছিলুম।

অনেক রাত হ'য়েছে, শুয়ে পড়লে ক্ষতি ছিল না।—তরুণ এই কথা কয়টি বলিয়া তেতালার সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইতেছিল, অম্বা অগ্রসর হইয়া বলিল—খাবেন না?

আছে না-কি কিছু?

আছে। আমিও ত এখন খাইনি।

তরুণ সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—বলেন কি!

একটু পরে আবার বলিল—আপনি খাননি কেন? আমি ত ব'লে গেছলুম যে আসতে আমার রাত হ'বে।

অম্বার মনে হইল বলে—খাব না এ কথাও ত বলে যান নি—কিন্তু ঠিক এই কথাটি কিছুতেই বাহির হইল না। সে একটু জড়িতকণ্ঠে বলিল—আপনি খান নি যে!—বলিয়া দ্রুত কম্পিত পদে ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

তরুণ তাহাকে অনুসরণ করিয়া দ্বার-সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই বলিল—আসুন।

তরুণ জুতাটি খুলিয়া রাখিয়া ঢুকিয়া পড়িল। বাজারে সামান্য কিছু জলযোগ করিয়া আসিয়াছিল, আর না খাইলেও চলিতে পারিত, কিন্তু কেমন একটা ক্ষুধা তাহার মনের মধ্যে

উঁকি দিতেছিল। সেটা আর কিছুই নহে—কেবলমাত্র অম্বা তাহার অপেক্ষায় অভুক্ত বসিয়াছিল বলিয়া!

অম্বা পেতেটি খুলিয়া একগ্লাস জল গড়াইয়া আসনের সম্মুখে রাখিয়া বলিল—বসুন।

শালপাতায় সাজানো লুচি তরকারী দেখিয়া তরুণ বলিয়া উঠিল—ওঃ—অনেক করেছেন যে!

অম্বা কোন কথা বলিল না। তরুণ বসিয়া পড়িল, কিন্তু ক্ষুধা তেমন ছিল না, আস্তে আস্তেই খাইতে লাগিল।

অম্বা নীরবে সাগ্রহে ভোজনরত তরুণের পানে চাহিয়া রহিল। আজ সে যেন মস্ত একটা সন্ধে জয়লাভ করিয়া ফেলিয়াছে! কাল ত বাজারের খাবারই চলিয়াছিল, আজও সকালে কোনরূপ জোগাড় হইয়া উঠে নাই, অন্নপূর্ণার মন্দির হইতে প্রসাদই আসিয়াছিল। অপরাহ্নে তরুণ বাহিরে যাইতেই কেশুয়ার জননীকে দিয়া বাজার হইতে জিনিষপত্র কিনাইয়া আহার্য্য প্রস্তুত করিয়াছিল। কতবার তাহার মনে হইতেছিল, হয়ত তরুণ বাহিরেই খাইয়া আসিবে! না খাইলেও সেই ওজর করিয়াই হয়ত তেতলায় শুইয়া পড়িবে! কতবার নৈরাশ্যে তাহার বুকটি ভরিয়া গিয়াছে, মনে হইয়াছে এ সমস্তই অপব্যয় হইবে! আশার একটি ক্ষীণালোকেও যে মাঝে মাঝে হৃদয় কন্দর পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছিল না,—এমন নহে।

আরও মনে হইয়াছিল, এই যে, সে খাবার করিয়া যাহার আশায়, নিজে না খাইয়া রহিল, সে-হয়ত গভীর নিশীথে নিঃশব্দে

আসিয়া কখন্ শুইয়া পড়িবে, সে জানিতেও পারিবে না! যেমন খাবার তেমনি পড়িয়া রহিবে, কাল প্রভাতে নিজের কাছেই সে নিদারুণ লজ্জায় ঘৃণায় মরণ কামনা করিবে।

কিন্তু যখন তাহার সকল নিরাশা আশঙ্কা দূর করিয়া তরুণ হাস্য-প্রফুল্ল মুখে খাইতে বসিল, তখনও তাহার যেন ঠিক বিশ্বাস হইতেছিল যে সে খাইতেছে। তরুণের সম্বন্ধে কোন ইতিহাস না জানিলেও এই সরল-গম্ভীর মূর্ত্তিটা তাহাকে যেন বেশ সন্ত্রস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। অম্বার হৃদয়ের যে অংশটা তাহার প্রতি শ্রদ্ধায় ভরিয়াছিল, সেইখান হইতেই একটা কথা ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল সে কি এমন অন্যায় করিয়াছে! কিসে এত পাপী সে? কেন তরুণ খাইবে না?

এ কেন-র উত্তর সে কোনদিক হইতেই না পাইয়া তাহার মনে ক্ষোভ জন্মিয়াছিল, কিন্তু তরুণ যখন অম্বার বিছানার উপর চাদরটি ফেলিয়া দিয়া খাইতে বসিয়া গেল, একবার একটা আনন্দ কোলাহলের মত তাহার মন বলিয়া উঠিল—না, না—সে কোন অন্যায় করে নাই, করে নাই! তাহার আর কোন দুঃখ নাই,—সে ধন্য হইয়াছে!

নয়

যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে সে তখন নিমজ্জিত ছিল, এই কয়েক মিনিটের ধন্য হওয়ার সুখটুকু অধিকক্ষণ তাহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিতে পারিল না। রাত্রে সে এই পুলকের অনাবৃত

রশ্মিটুকুকে দুইহাতে বুকের মধ্যে চাপিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল, কখন নিদ্রা আসিয়া তাহার সমস্ত সুখ ও চিন্তার অবসান আনিয়া দিয়াছে, সে জানিতেই পারে নাই—যখন ঘুম ভাঙ্গিল, অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে।

খেলনাটি কোলে লইয়া শিশু যেমন ঘুমাইয়া পড়ে, সেও সেইরূপ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, কখন্ মা কাচের খেলনাটি সরাইয়া রাখিয়াছেন নিদ্রাভঙ্গে শিশু যেমন তাহার কোন সন্ধানই পায় না আজ ঘুম ভাঙ্গিতেই অম্বা বুঝিতে পারিল, আবার তাহার পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে।

তাড়াতাড়ি দ্বারটি খুলিতেই গৃহিণীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি তখন লাল পাড় গরদের সাড়ীর আঁচলখানা গলায় বেষ্টন করিয়া বারান্দায় সূর্য্যস্তব করিতেছিলেন। তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন—ছেলে-যে আজ ভোরে তেতলা থেকে নাম্‌লেন? তুমি বুঝি টের পাওনি?

অম্বা জোর করিয়াও মুখখানি তুলিয়া রাখিতে পারিল না। গৃহিণী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—ভজুয়া বল্লে—তিনি এগারটার পরই ফিরিয়াছিলেন—তুমি বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিলে বৌ-মা?

অম্বার মুখ দিয়া কে যেন বলাইল—হাঁ।

গৃহিণী একটু হাসিয়া সূর্য্যবন্দনায় মন দিলেন। অম্বা দ্রুতপদে নীচে নামিয়া আসিল। কল-ঘরে ঢুকিয়া তাহার মনে পড়িল, এ কি মিথ্যা আশ্রয় করিয়া আছে সে! কিন্তু এ ছাড়া অন্য উপায়ও

যে নাই—তাহাও সে জানিত। তবু এই মিথ্যা বলার অপরাধ তাহাকে কোন মতেই নিস্কৃতি দিল না।

আট-টা বাজিতেই তরুণ একখানা বাংলা খবরের কাগজ হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিল। অম্বা বারান্দার কোণে বসিয়া তরকারী কুটিতেছিল। তরুণের পদশব্দটা যেন তাহার সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল, চেষ্টা করিয়াই সে মুখ ফিরাইল না।

তরুণ বলিল—একবার উঠে আসবেন ?

অম্বার বুকের ভিতরে ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া উঠিল। একেবারেই যেন তাহার মনে হইল—কি একটা সংবাদ সে আনিয়াছে।

তরুণ এক মিনিট পরেই পুনরায় বলিল—একবার আসুন-না।

অম্বা ঠক্ করিয়া বঁটিখানি কাৎ করিয়া রাখিয়া উঠিয়া পড়িল। এক মুহূর্তের জন্য তরুণের মুখের পানে চাহিয়া দ্রুতপদে ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। তরুণ কাগজখানি তাহার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল—দেখুন দেখি, ঐ-কি !

অম্বা কিছুই বুঝিতে পারিল না, খবরের কাগজের সঙ্গে তাহার মিলাইয়া লইবার মত কি আছে—এই ভাবিতে ভাবিতে সে কাগজটি খুলিয়া ধরিতেই দেখিল—ভীষণ অপঘাত মৃত্যু !

তাহার নীচে আরও দু'তিনটা লাইন ছিল, না দেখিয়াই অম্বা জিজ্ঞাসিল—কিসের এ ?

তরুণ বলিল—দেখুন-না। আপনার সঙ্গীটি কি ?

অম্বা বিবর্ণ মুখে বলিয়া উঠিল—অ্যাঁ !—সে কাগজটি পড়িয়া ফেলিল।

সে-ই !

সে আর একবার পড়িল।

"—দিন ভোর রাত্রে কিউল জংসন ষ্টেশনে এক হিন্দুস্থানী যুবকের ভীষণ মৃত্যু ঘটিয়াছে। যুবকের পকেটে দুইখানি খামারগাছী হইতে কাশীর মধ্যশ্রেণীর টিকিট, একখানি হো কোম্পানীর নোট-বুক ও কয়েকটি টাকা পয়সা পাওয়া গিয়াছিল। নোট-বুকে নাম ছিল—ব্রিজমল। কোন ঠিকানার উল্লেখ ছিল না। তদন্তে প্রকাশ, ফাইভ অপ এক্সপ্রেস ট্রেণে সে ও তাহার সঙ্গী কাশী অভিমুখে যাইতেছিল। কিউল ষ্টেশনে প্লাটফরমে কেলনার কোম্পানীর হোটেলে সে একটা মদের বোতলও ক্রয় করিয়াছিল। মিঞাজান নামধারী বয় তাহার দেহ সনাক্ত করিয়াছে। অনুমান যে সময়ে সে দোকানে প্রবেশ করিয়াছিল, গাড়ী ঠিক সেই সময়েই ছাড়িয়া দেয়। বাহিরে আসিয়া গাড়ী না দেখিয়া সে উন্মত্তের মত ছুটাছুটি করিতেছিল—রামটহল টহল দিতে দিতে তাহাকে দেখিয়াছিল। এই সময় এস্ বি (সাউথ বিহার), লুপ ও মেইল লাইনের তিনখানি গাড়ী আসিয়াছিল। কোন গাড়ীর সানটিং এঞ্জিনে ধাক্কা লাগিয়াই তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে, এইরূপই অনুমান। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।......আমরা এই সূত্রে বলিতে চাই সে হিন্দুস্থানী যুবকটি যদি ত্বরা না করিয়া—ইত্যাদি ইত্যাদি।

তরুণ একখানা চৌকি টানিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসিল—আপনারা কবে বেরিয়েছিলেন বলুন ত ?

সেই গাড়ীতে যেদিন আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সেইদিন ভোরে।

তরুণ কাগজটি পড়িতে পড়িতে বলিল—নামও দেখ্‌ছি ব্রিজমল। আচ্ছা, ঠিক করে বলুন ত, এমন অঘটন-সংঘটন হ'ল কি করে আপনাদের ?

অম্বা তাহার কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গের ছায়া পরিকল্পনা করিয়া বলিল—কি হ'ল ?

তরুণ বলিল—কি করে আপনি এমন একটা মেড়োর সঙ্গে এলেন, তাই ভাবছি—আমি।

অম্বা জবাব দিল না, যেমন নতমুখে বসিয়াছিল, তেমনি রহিল। চাবির গোছাটি নাড়িতে নাড়িতে কি ভাবিতে লাগিল। সেই প্রায়ান্ধকার কক্ষের দ্বারের দিকে পিছন করিয়া সে বসিয়াছিল, তরুণ তাহার মুখ স্পষ্ট দেখিতে পায় নাই, সে পূর্ব্বের মতই বলিল—আচ্ছা, কি ভেবেছিলেন আপনি ? সে আপনাকে বিয়ে করত ?

যদিও ইহা কোনদিন তাহাকে চিন্তা করিয়া আবিষ্কার করিতে হয় নাই, ব্রিজমল অঙ্গীকার করিয়া তাহাকে আনিয়াছিল, কিন্তু সে তাহা বলিতে পারিল না ; তরুণের কথা শেষ হইতেই সে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিতে লাগিল।

তরুণ জবাব পায় নাই বলিয়া বিরক্ত হইলেও মুখে প্রকাশ করিল না, অধিকতর কোমলকণ্ঠে বলিল—সে যদি স্ত্রী বলে থাকে, আপনি বিশ্বাস করলেন কেমন করে বলুন ত ! ও বেটারা……ও কি ও ! কাঁদছেন না-কি !

ESTD. 1907

অম্বা এবার কাপড় তুলিয়া মুখে চাপা দিল।

তরুণ বলিল—দেখুন, কাঁদবেন না; কেঁদে কোন ফল হ'বে না। আপনার বাবার চিঠি পেলেই সব গোল মিটে যাবে।

একদিন পূর্ব্বে ভবিষ্য-দুঃখের অভিশাপ দিয়াছিল বলিয়া তাহার যেন কেমন লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। আজ-ও যে তাহার পূর্ব্বমত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা নহে, তবে সহবেদনায় মনটি ম্রিয়মান হইয়া গিয়াছিল।

প্রায় পাঁচ মিনিট কাটিয়া গেল, কেহ কোন কথা কহিল না। হঠাৎ তরুণ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—স্নান হয়ে গেছে?

অম্বা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—হইয়াছে।

তরুণ বাহির হইয়া যাইতেছিল, অম্বা বলিল—দাঁড়ান।

তরুণ নিঃশব্দে সপ্রশ্নদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। অম্বাও দাঁড়াইয়াছিল, মুখখানি বিষণ্ণ করিয়া বলিল—সব বল্‌ছি আমি......

না থাক্। বল্‌তে আপনার কষ্ট হবে।

হোক্। আপনি শুনুন।—এদিকের দরজাটা......

তরুণ সিঁড়ির পথের দরজাটি বন্ধ করিয়া দিল। অম্বা এক নিঃশ্বাসে যাহা বলিল, তাহার সারমর্ম্ম এই—ব্রিজমল হাতিবাগানায় দেশী ও বিলাতী কাপড় বেচিত, তাহাদের বাড়ীর একটি ঘরেই তাহার দোকান এবং বাসস্থান ছিল। অম্বার বাপ ছাড়া ত্রিভুবনে কোন আত্মীয়ের সংবাদ সে জানিত না। ব্রিজমল আস্তে আস্তে তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া, বিবাহে আশা দিয়া সেদিন ভোরের গাড়ীতে গৃহত্যাগ করাইয়াছিল।

অম্বা যখন শেষ করিল, তরুণ আর তাহার দিকে চাহিল না। সে দ্বারটি খুলিয়া বাহির হইয়া গেল। কলকাতার মত কাশীতেও দশটা বাজিতেই কলের জল চলিয়া যায়, স্নানঘরে ঢুকিয়া পড়িল। কিন্তু এ কথাটি সে কিছুতেই আয়ত্ত করিতে পারিল না যে বাঙ্গালীর মেয়ের এ কি প্রবৃত্তি। ইহারা ত তেমন শিক্ষিতাও নয় যে বিলাতী আবহাওয়াকে দোষ দিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারা যাইবে।

দশ

পরদিন ৮টার সময় ডাকপিয়ন একখানা খামের চিঠি ফেলিয়া দিয়া গেল। তরুণ চিঠিখানি খুলিয়া অম্বার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখের রক্তশূন্যতা, চক্ষের দৃষ্টি দেখিয়াই অম্বার বুঝিতে বাকী রহিল না যে তাহার হাতে ও কিসের চিঠি! চিঠির ভিতরটাতে কি লেখা আছে একেবারে যেন স্পষ্ট হইয়া তাহার চক্ষে ফুটিয়া উঠিল। তরুণ চিঠিখানি তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিল—এই নিন্।

দুর্নিবার শক্তিতে দক্ষিণ হস্তটি বসনতল হইতে বাহির করিয়া অম্বা পত্রটি কুড়াইয়া লইল। তখনও সবটা পড়া হয় নাই, তরুণ বিকৃতস্বরে বলিল—দেখ্‌লেন, অপরাধটা আমার দাঁড়িয়েছে কি রকম?

আপনার?—বলিয়া অম্বা দীনভাবে চাহিল।

না?' এই দেখুন—বলিয়া সে পত্রটি তাহার হাত হইতে

টানিয়া পড়িতে লাগিল—পুনরায় যদি তুমি আমাকে বিরক্ত কর, তোমাকে পুলিশে দিব। তুমি একটি শয়তান, নহিলে তুমি এমন কার্য্য করিবে কেন? তোমাকে আশ্রয় দিয়াছিলাম, কাল সর্পের মত আমাকে দংশন করিয়াছ। এখন তাহাকে লইয়া যাহা তোমার খুসী তাহাই করিতে পার। কেবলমাত্র আমার অনুসন্ধান করিও না, তাহা হইলে বিপদে পড়িতে হইবে।—তরুণ থামিয়া পড়িল; অম্বার পানে চাহিয়া তীব্র ব্যঙ্গের সহিত বলিল—এ একরকম মন্দ ব্যাপার নয় কিন্তু, কি বলেন? জানলুম না, শুনলুম না......

অম্বা পত্রের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বলিল—তারপর?

তরুণ পত্রটি পাঠ করিতে লাগিল—তোমার চালাকি আমি বুঝিতে পারিয়াছি। বাঙ্গালী নাম দিয়া তুমি দোষ স্খালন করিতে চাও? আমি তোমাকে স্থির বলিতেছি—আমার কন্যার সহিত কোন সম্পর্কই আমার নাই।

তরুণ মুখ তুলিয়া বলিল—আপনার বাবা কি করেন?

অম্বা ক্ষীণস্বরে কহিল—কিছু করেন না।

তাই দেখ্‌ছি।—বলিয়া সে চিঠিখানি আগাগোড়া আর একবার পড়িল, এবার মনে মনে। দুই তিন মিনিট পরে বলিল—তাইত!

অম্বা কিছু বলিতে পারিল না। তরুণের মনে হইল, সে যেন আবার কাঁদিবার চেষ্টা করিতেছে। মৃদুকণ্ঠে কহিল—দেখুন, আমি একটা কথা বল্‌ছি কি—আপনি যাবেন দেশে?

অম্বা কথা কহিল না। তরুণ বিস্মিত হইল না, এ রকম পত্রের পরে পিতার সম্মুখীন হইতে যে সহজে সম্মত হওয়া যায় না—ইহা ত সম্পূর্ণ স্বাভাবিক—তাই একটু পরে বলিল—আপনি চলুন, আমি আপনাকে নিয়ে যাই, তা হ'লেই তাঁর সব ভুল ভেঙ্গে যাবে।'

সে উত্তর প্রতীক্ষা করিয়া রহিল, কিন্তু কোন জবাব আসিল না। তখন অনুযোগের স্বরে বলিল—কি বলেন ?

অম্বা ছলছল মুখখানি তুলিয়া চাহিল মাত্র। দুই মিনিট পরে বলিল—না।

এবার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এত বড় সহজ প্রস্তাব যে উপেক্ষা করিতে পারিবে ইহা যেন তাহার বোধগম্যই হইতেছিল না। এবং ইহা ছাড়া যে কোন উপায় কোনদিকে আছে সে ত অনেক ভাবিয়াও পায় নাই। এই দুইদিন সে নিয়ত এই চিন্তাই করিয়াছে। অম্বার পিতার পত্র যে এইরকম নিষ্ঠুর সংবাদই আনিবে ইহাও সে ভাবিয়াছিল, কিন্তু এ বিশ্বাসও তাহার ছিল যে অম্বা যদি একবার তাহার পিতার কাছে যাইয়া দাঁড়ায়, তিনি তাহাকে বিমুখ ত করিতে পারিবেনই না, নিজের মেয়েকে আত্মীয়-জনহীন সংসারে একটু স্থান দেওয়াও হয় ত অসম্ভব হইবে না। পত্র-প্রাপ্তির পরেও এই কথাটিই তাহার মনে জাগিতেছিল, কিন্তু অম্বা যখন দৃঢ়তার সহিত প্রত্যাখ্যান করিল, তখন যেন বিব্রত হইয়া পড়িল; কোনদিকেই যেন কূলকিনারা দেখিতে পাইল না।

অম্বার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতেও সে আর পারিল না।

দু' এক মিনিট অপেক্ষা করিয়া, অম্বাকে নতমুখী. নিঃশব্দ দেখিয়া বাহির হইয়া গেল।. অম্বার হৃদয়দ্বন্দ্বটা যে একটুকুও সে বুঝে নাই, তাহা নহে।

অম্বার অবিমৃষ্যকারিতায় সে যেমন বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাকে পতিতা কল্পনা করিয়া কত কুকথাই না বলিয়াছিল—আজ পূর্ব্বাপর সকলদিক বিবেচনা করিয়া অত্যন্ত দুঃখবোধ করিতে লাগিল। অম্বা যে পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তাহার কারণটিও যেন সেই মুহূর্ত্তে তাহার নিকট সুস্পষ্ট হইয়া গেল।

প্রথমেই তাহার মনে হইল, অম্বার পিতা না হইয়া জননী যদি জীবিতা থাকিতেন, তিনি কখনই এমন নির্দ্দয়-পাষাণ হইতে পারিতেন না। নিজের জননীর মহীয়সী মূর্ত্তি যে তাহার হৃদয়মনে ভরিয়াছিল, কোন দেশে কোন কালে কোন জননীই যে অন্যরূপ হইতে পারেন এ ত সে ভাবিতেও পারে না।

সে নিজের সঙ্গেই তর্কে প্রবৃত্ত হইল। তাহার মন প্রশ্ন করিল—আচ্ছা, আমার মা'র যদি একটি কন্যা থাকিত আর সে কন্যা অম্বার মত—

তরুণ তাহার জবাব দিল—মা হয়ত গ্রহণ করিতেন!

মা'র সঙ্গে সেই তর্কের কথাটাও তাহার মনে পড়িয়া গেল—মনটি সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিল, তখনই যেন একটা বৈদ্যুতী শক্তিতে উত্তেজিত হইয়া সে ভাবিতে পারিল যে, না, ইহার সহিত তাহার কি মিল আছে? এ যে একেবারে

নিরপরাধ! মা কখনই তাঁহার মেয়েকে ত্যাগ করিতে পারিতেন না।

একটা পথে চলিতে চলিতে, যখন উদ্দেশ্যটি অপ্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়, এতটা পথ বৃথা চলার ক্ষোভে পথিক যেমন ক্ষুণ্নমনে ফিরিয়া পড়ে' তরুণও তেমনি ফিরিয়া আসিল—ভাবিল, সত্যই ইহার অবস্থাটি কি ভীষণ! মেয়েটির বাবা যে রকম দেখা যাইতেছে, সে যে মত বদলাইবে বিশ্বাস হয় না।

আজ কিন্তু এর মীমাংসা সে করিয়া লইতে চায়! আর ত কোনদিকে এতটুকু আশা নাই! এ যে ক্রমশঃ দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠিতেছে! সে আর একবিন্দু আবছায়ার মধ্যে থাকিতে পারিবে না!

তখনই মনে পড়িল, বুঝা পড়া সে করিবে কার সঙ্গে। সে হয়ত এতক্ষণ ধরাশয্যা গ্রহণ করিয়াছে! উঃ কি ডেয়ারিং! বাঙ্গালীর মেয়ে! তরুণের মনে হইতেছিল—সে কি করিয়াছে!!! মেয়েটি তাহার নিজের অবস্থা জানে না; জানিলে ভূত দেখার মত কাঁপিয়া উঠিত! আচ্ছা সে কি বুঝিতেছে না! নিশ্চয়ই! এ আর না বুঝে কে? বিশেষতঃ বয়স হ'য়েছে! কি রকম মনের ভাব তাহার হইতেছে—এই চিন্তায় প্রায় পাঁচ মিনিট কাটিয়া গেল, তাহার স্মরণ হইল—এই অধিকার কেহ তাহাকে দেয় নাই এবং তাহারই চর্চ্চা করাটাকে লোকে অনধিকার বলে থাকে!

কিন্তু তাহার কি হইবে? লেখাপড়া জানে না যে চাকরী

করিতে পারবে! আর কি-ই বা করিবে! তবে একটা হইতে পারে, যদি কেহ ইহার খরচ বহন করে, সে অজয়কে নিয়া মেডিক্যালে ভর্ত্তি করিয়া দেয়—একটু নার্শগিরিও শিখিয়া নিতে পারে—ক'রে খেতে পারবে! তাই বা পারবে কি করে, সে যে ইংরেজী দরকার—সেদিকে কিছু নেই ত! তবে সে কি করিবে? তাহার পিতা নাই, মাতা নাই, এত বড় ব্রহ্মাণ্ডে কোনদিকে কোন আত্মীয়ের কোন সন্ধানই ত কেহ জানে না—এ সে কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, বন্ধুহীন, গৃহহীন, ভদ্রঘরের মেয়ে এ, করিবে কি!—সত্যসত্যই তরুণের পুরুষ হৃদয় মথিত হইয়া উঠিল; মনের সব তারগুলিতে একই স্বর ধ্বনিয়া উঠিতেছে—অকস্মাৎ সে বলিয়া উঠিল—ঠিক হইয়াছে!

তাহার গুরুদেব আছেন। বাল্যাবধি তরুণের এ বিশ্বাস দৃঢ় ছিল যে যত বড় বিপদ হোক, এমন ক্ষমতার প্রভূত পরিচয় সে পাইয়াছে, যাহা কেবলমাত্র অমানুষিক নহে, অনেকের কাছে একেবারেই অস্বাভাবিক! অথচ সে ত জানে! সে যে ছ' বছর মনে প্রাণে তাঁর রচিত আশ্রমটির সঙ্গে বিজড়িত হইয়াছিল। সারারাত বদ্ধঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া, খড়খড়ির ফাঁকে ফাঁকে অরুণ কিরণে শিশু যেমন ক্ষুদ্র বুকটির ক্ষুদ্র উল্লাসে উঠিয়া পড়ে, ডাকিয়া ঠেলিয়া জননীর ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেয়—তরুণও এই চিন্তায় উল্লসিত হইয়া উঠিল।

দুপ্ দাপ্ করিয়া পা ফেলিয়া সে নীচে নামিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল—কি করিয়া প্রস্তাবটি করিবে? সে না হয় হইয়া

গেল—কিন্তু গিয়া যদি দেখে অম্বা ধূলায় পড়িয়া লুটাপুটী খাইতেছে, তখন ? তখন ফিরিয়া আসিবে, এই কথা ভাবিতে ভাবিতে সে বারান্দায় আসিয়া দেখিল, অম্বা উনুনের উপর কড়ায় কি একটা খুন্তী দিয়া খস্‌খস্‌ করিয়া নাড়িতেছে। বিস্মিত হইলেও তরুণ অশিক্ষিত এই মেয়েটির দৃঢ়তার প্রশংসাই করিল।

তাহাকে নিকটে আসিতে দেখিয়া সে খুন্তীটি রাখিয়া দিল। প্রথম মুহূর্ত্তেই অম্বার রাঙ্গা মুখখানির পানে চাহিয়া তাহার মনে হইল—এ কি শুধুই আগুন তাত !

কিন্তু ভাবিবার এ সময় নয়, মাটির পানে চক্ষু রাখিয়া বলিল—ঠিক কর্‌লুম—

অম্বা হাত ধুইতেছিল, হাত দুটি কাপড়ে মুছিতে মুছিতে বলিল—ঘরে আসুন।

তরুণ তাহাকে অনুসরণ করিয়া চলিতে চলিতে ভাবিল—বাস্তবিক ত এ অশিক্ষিতা নহে; বরং নিজের ব্যবহারটির সে সমর্থন করিতে পারিল না।

ঘরে পা দিয়াই অম্বা জিজ্ঞাসা করিল—কি ব'লছিলেন ?

তরুণ এক মিনিট কি ভাবিল, আস্তে আস্তে বলিল—আপনার একটা……

অম্বা যেন কি বলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

তরুণের মনে হইল—তবে এ-ও একটা কিছু ভাবিয়াছে, তাহার সাহস বৃদ্ধি হইল, বলিল—আমার গুরুদেবের আশ্রমে আপনার থাকা চলতে পারে—তাই—থাক্‌বেন কি আপনি ?

অম্বা একটুখানি তরুণের পানে চাহিয়া থাকিয়া পরিহাস-তরল-কণ্ঠে বলিল—আশ্রম !

আজ্ঞে হ্যাঁ।

মেয়েটি আবার বলিল—আশ্রম !

তরুণ বিস্মিত হইয়া বলিল—হ্যাঁ, তাইত বলছি আপনাকে। সেখানে থেকে আপনি অনেক কাজ করতে পারবেন। চাই-কি ইচ্ছা করলে লেখাপড়াও শিখতে পারেন, ছবি আঁকা, গান.....

অম্বা মৃদু হাসিয়া বলিল—স্কুল বলুন।

তা বলতেও আপত্তি নেই। সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল, অম্বা দ্বারটি ভেজাইয়া দিয়া বলিল—ছেলের না মেয়ের ?

তরুণ প্রশ্নটাই বুঝিল না, তা' জবাব দিবে কি ! বলিল—কি বলছেন ?

বোধ করি একটুখানি উষ্মা তাহার কণ্ঠে জমিয়াছিল, কথাটার উত্তাপ অম্বা ঠিকই ধরিয়াছিল, বলিল—সেখানে আমি যেতে পারব না।

তরুণ দুই মুহূর্ত অম্বার মুখের পানে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। যাইবে না ত করিবে কী !—বলিল—নইলে ত আমি আর কোন উপায়ই দেখ্ছি নে !—তাহার কেমন বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে যে যত অল্পশিক্ষিতাই সে হোক্, তাহার ভিতরে এমন একটা জিনিষ আছে, যাহার উপেক্ষা অন্ততঃ তরুণ করিতে পারে না, তাই আবার বলিল—আপনি কিছু ভেবেছেন কি ?

এখনও অম্বার মুখে-চোখে বিদ্যুৎ-লীলার মত সেই চাপল্যটুকু

খেলা করিতেছিল; সে দু'টি হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যে কাপড়ের কালো রংয়ের পাড়টা খুঁটিতে খুঁটিতে অসংলগ্নভাবে গেল—আমি ফিরে যাব।

বাবার কাছে!—তরুণের স্ফূর্ত্তি হইল, সে বলিল—সে ত সব চেয়েই উত্তম! যাবেন তাই?

যাব।

আর দু'একটি কথার পর তরুণ হৃষ্টচিত্তে ঘরের বাহির হইয়া গেল। নিজের ঘরে আসিয়া মা'কে চিঠি লিখিতে বসিল।

এগারো

তরুণ আহারে বসিয়াছে, অম্বা একটু দূরে বসিয়া দু'টি ভাঁড়ে উষ্ণ দুধটা ঢালাঢালি করিতেছিল, তরুণ তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—কাশীটা একটু বেড়িয়ে নেবেন না? আমি আজ একটা গাড়ী নিয়ে সব ঘুরব ভাবছি।

অম্বা জবাব দিল না। তরুণ পুনরায় বলিল—আপনিও ঠাকুর দেবতা সব দেখে নিন। আচ্ছা, বলুন ত, এই ক'দিন ত আপনি একটিও ঠাকুর দেখলেন না! তার মানেটা কি? মানেন না, না-কি? শেষের দিকটা একটুখানি সঙ্কোচের সহিতই বলিয়াছিল।

অম্বা দুধের ভাঁড়টি পাতের সম্মুখে রাখিয়া বলিল—কেন মানব না? মানি। আপনি মানেন না?

তরুণের মায়ের সঙ্গে একদিন এ-তর্ক হইয়া গিয়াছে।

সেদিন তর্কের সময় জোরগলায় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল ও সব হাম্বাগ! কিন্তু সব পরীক্ষার সময়েই না-জানি কথন্ অনেক রকম বিরকমের দেবতার নাম করিয়া সে ঘরের বাহির হইত। সত্যবতীর সঙ্গে তর্কে তরুণের মস্ত একটা সুবিধা ছিল এই, হার-জিতে লাভ-লোকসান তার সমানই ছিল, অথবা কোন পক্ষেরই কিছু ছিল না। সে জানিত, সত্যবতীর নিজের মতামত কোন যুক্তিতর্কেই ত্যাগ করিবেন না; এবং যেটি তাঁহার মত নয়, কিছুতেই গ্রহণ করিবেন না, কাজেই তরুণ তর্কের সময়ে যত রকম যুক্তিতর্কের তীক্ষ্ণ শরগুলি তাহার তূণে থাকিত নিক্ষেপ করিতে ছাড়িত না।

আজ এ মেয়েটির কাছে মত অমত ধরা দিতে তাহার ইচ্ছা হইল না, সে একটু ভাবিয়া লইয়া বলিল,—মানামানির কথা ছেড়ে দিন। আমি হয়ত সব মানি না, আবার যা মানি—সে সকলের চেয়ে একটু বেশী করেই মানি। আপনি ক'দিনে একবারও বেরুলেন না কিনা, তাই জান্‌তে চাইছিলুম।

অম্বা বলিল—খাচ্ছেন কৈ?

তরুণ হাত গুটাইয়া বসিয়াছিল, একটু লজ্জিতভাবে ভাত মাখিতে মাখিতে বলিল—যান যদি, আমি সব ব্যবস্থা করে দিই।

না—বলিয়া অম্বা উঠিয়া গেল; নর্দ্দামার পাশে ঘটি ও গামছাটি রাখিয়া দিয়া বলিল—আপনি কি এখুনি বেরুচ্ছেন?

হ্যাঁ—কিছু দরকার আছে?

আপনার ইস্কুলের গল্পটা শুনতুম একটু?

তরুণ হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল, কিছুক্ষণ কথা কহিল না। জোর করিয়া দু'তিন গ্রাস ভাত গালে পুরিয়া চিবাইতে চিবাইতে বলিল—'গল্প' বলছেন কেন?

অম্বা কথা কহিল না। তরুণ একমিনিট পরে বলিল—শুনবেন? বলব একদিন, কিন্তু আজ ত হ'বে না—আজ গাড়ীর বন্দোবস্ত করে ফেলেছি কি-না।

সে হাত ধুইতেই অম্বা জিজ্ঞাসিল—আপনি পান খান্ কি?

খাই মাঝে-মাঝে! অভ্যাস নেই।

খান ত? এই নিন্—দু'টোই নিন্ না—ভয় নেই?

তরুণ বিস্ময়পূর্ণ স্বরে বলিল—ভয় কিসের?

অম্বা স্বাভাবিক সহজস্বরে কহিল—জানেন না? আমাদের দেশে হাতকান্দায় আছে ওসব! হাসছেন?—আমি নিজে ফল দেখেছি—হাতে হাতে!

তরুণের হাসি আসিল, সেটুকু গোপন করিয়া বলিল—বলেন কি!

যান্ ত দেখিয়ে দিতে পারি। একটু থামিয়া জোর দিয়া বলিল—সত্যি বলছি—সেবার তারক সরকারের বাড়ীতে দেখেছিলুম।

এবার সত্যই তরুণ বিরক্ত হইল, বলিল—যেতে দিন ওসব।

চটি পায়ে দিতে বলিল—আপনি খেতে বসুন।

অম্বা নতমুখে বলিল—আপনার আশ্রমের কথায় আমি একটু হেসেছিলাম আপনি একেবারে চটে গেছলেন, কিন্তু আমি-যা

সত্যি দেখেছি তা'তে আপনি হাস্‌লেন। সে থামিল, মুখখানি তুলিয়া হাসি-হাসি চোখে-মুখে বলিল—আমি কিন্তু রাগি নি।

তরুণ একটু হাসিয়া চলিয়া গেল। যতক্ষণ গাড়ী আসিতে দেরী হইতে লাগিল, সে কেবলই এই পরাজয়ের লজ্জাকর মাধুরীটাই যেন অনুভব করিতে লাগিল। কত বড় খোঁচাতে সেই অশিক্ষিত পল্লী কিশোরীটি যে তাহার শিক্ষাভিমান হাসিমুখে চূর্ণ করিয়া দিয়াছে—তাহারই অনুশোচনার সঙ্গে একটি অস্পষ্ট প্রীতির ভারে মনটি বুকের মধ্যে ফুর ফুর করিয়া উড়িতে লাগিল।

এই কয়েকদিনের পরিচিতা মেয়েটিকে সে বারবার করিয়া সত্যবতীর সহিত যেন মিলাইয়া লইতেছিল, আজ পরাভবের পরই সে আপনার কাছে মুক্তহৃদয়ে স্বীকার করিতে বাধ্য হইল—ঠিক এই রকম একটা জিনিষ সে সত্যবতীর ভিতরে লক্ষ্য করিয়াছে! প্রস্ফুটিত পদ্মের মত নীরব-সুন্দর সত্যবতীর মুখখানি, তাঁহার স্থির নক্ষত্র-ভাস্বর চক্ষু দুটি, স্নেহ-গভীর কণ্ঠস্বরটি তাহার অঙ্গে অঙ্গে শোণিতের মত মিশিয়াছিল, আজ তাহার মনে হইতে লাগিল, অম্বাও ঠিক সেইরূপই—মূর্ত্তিমতী!

নিজের মনেই তরুণ বুঝিয়াছে যে, এই যে অম্বার দেবতার প্রতি নিস্পৃহ অনাসক্তির ভাবটিও যেন সে সত্যবতীর কাছেই শিখিয়া আসিয়াছে! কিন্তু আসলে যে-সে সত্যবতীর মতই প্রগাঢ় ভক্তিমতি, তাহা তরুণ সেইদিনই জানিতে পারিল যখন অম্বা ছলছল মুখে ব্যথিত-কণ্ঠে বলিল—তরুণবাবু, দেবমন্দিরের

পবিত্রতা আমার স্পর্শে ক্ষুন্ন হ'বে যে!—তরুণ বলিতে পারিল না যে দেবমন্দিরের শুচিতা এত লঘু নহে।—মনে মনে অম্বার প্রশংসা করিতে লাগিল।

আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে এমন একটা সময় আসে যখন কাব্যোক্ত বসন্তসমাগম সত্যই প্রীতিকর হইয়া উঠে; মধুর বাতাস, মধুর চাঁদিনী, মধুর চিন্তা বিশ্বজগৎটাকে একেবারে মধুময় করিয়া তুলে—হয়ত তরুণের তেমনি একটা মধুময় মুহূর্ত্ত আসিয়াছিল—কিন্তু আজীবন এমন একটি শান্ত অথচ গম্ভীর, পেলব দৃঢ় ছায়াতলে সুবর্দ্ধিত হইয়া আসিয়াছে যে সেখানে কোকিলের কুহুরবের সঙ্গে সঙ্গেই সত্যিকারের জীবনের পাশাপাশি সংমিশ্রণ ছিল, যাহাতে করিয়া সে নিজেকে সংযত করিয়া বলিল—বাঃ এ ত বেশ করিতেছি আমি!

যেন সে হৃদয়-দর্পণে হঠাৎ নিজের শুষ্ক প্রতিচ্ছবিটি দেখিয়াই সরিয়া গেল। সারাদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে স্থির করিয়া ফেলিল—জীবনটিকে সৌখীন করিয়া তুলিবার সময় বা চেষ্টা কোনদিন তাহার না-ই, হইবেও না।

সশ্রদ্ধ চিন্তায় সে স্মরণ করিল—সেই সর্ব্বত্যাগী কর্ম্মবীরটির পদতলে বসিয়া কতদিন কত উচ্চ আদর্শ লক্ষ্য করিয়া, জীবন গড়িয়া তুলিবার গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। বাল্যের আশ্রমে সে ত কেবল শিক্ষার্থীই ছিল না, আজ তাহার ম'ন হইতে লাগিল, মানবজীবনের কঠিন-সমস্যাগুলি কেমন স্পষ্ট করিয়া তাহাদের সম্মুখে তিনি প্রতিফলিত করিয়া দেখাইতেন! একটু

একটু করিয়া কেমন তাহাদের বাল-হৃদয়গুলি উদ্দীপিত হইয়া উঠিত, তাহাও তাহার মনে পড়িয়া গেল।

ভক্ত যেমন দেব-মন্দিরটির শুচিতা রক্ষা করিয়া ফেরে, তরুণের বুকের ভিতর এই-একটা জিনিষ আছে, যাহার শুচিতা এবং গোপনতাই ছিল তাহার কাছে ধ্রুব কর্ত্তব্যের মত। অনেকবার সে বলি-বলি করিয়াও সত্যবতীর গোচর করিতে পারে নাই—অন্য পরে আর কথা কি! শিশুর ক্রীড়নকের মত তাহার সর্ব্বদা ভয় ছিল, পাছে কেহ উপেক্ষা করে—সে বেদনা সহ্য করিতে কখনই সে পারিবে না।

আজও ফিরিতে তাহার রাত হইয়া গিয়াছিল। ভজুয়া মধ্যরাত্রে নিদ্রাভঙ্গ-জনিত কষ্টে বিড়বিড় করিয়া জানাইয়া দিল—'এই সন' ভাড়াটে সে 'বাপের বয়সে' দেখে নাই

উপরে উঠিয়া দেখিল, অম্বার ঘরের দরজাটি খোলা আছে, খানিকটা আলো সামনের বারান্দায় আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার পদশব্দেই অম্বা উঠিয়া বসিয়াছিল, এক্ষণে বাহিরে আসিয়া বলিল—অনেক রাত হয়ে গেছে। নিন্—ঐখানে জল আছে, হাত পা ধুয়ে ফেলুন।

তরুণ খাইতে বসিল। একটু হাসিয়া বলিল—আচ্ছা ঠিক করে বলুন ত, আমরা কি দু'চারদিনের পরিচিত?

কথাটা সে সহজভাবেই বলিয়াছিল, কিন্তু অম্বা যখন সে কথার কোন জবাব না দিয়া দরজাটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তখন হঠাৎ সে অম্বার পানে চাহিয়া অনুতপ্তকণ্ঠে বলিল,—

আপনার খাওয়া হ'য়ে গেছে?—অম্বার ব্রীড়াবনত মুখ লক্ষ্য করিয়া বলিল,—হয় নি!

এবার অম্বা কথা কহিল, হাসিয়া প্রফুল্লকণ্ঠে বলিল,—তা কি-হয়?

হয়-না বুঝি?

আমাদের হয়-না?

পরিহাসের মতই তরুণ জিজ্ঞাসিল—'আমাদের' মানে?

অম্বাও হাসিল, বলিল,—মেয়েমানুষের।

একমিনিট পরে তরুণ সহাস্যে বলিল,—আচ্ছা, বিরিজমলকেও কি অতিথিসেবাটা আপনিই করেছিলেন?

অম্বার মুখ কাণ, চোখের কোণ সব লাল হইয়া উঠিল, কিন্তু সে এক অনুপলের জন্য। সে তখনি বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিল,—অতিথি নারায়ণ, এই কথা আমরা শিখেছিলুম ছেলেবেলায়।

একমুহূর্ত্ত থামিয়া অম্বা বলিল, অতিথির সেবা করে কি তৃপ্তির শেষ হয়? মহাভারতে পড়েছেন ত……

তরুণ সহাস্যে মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে বলিল—অতদূরেই বা যেতে হবে কেন? বাঙ্গালীর ঘরের মেয়েদের দেখলে সেটা বুঝতে ত দেরী হয় না। এই যেমন দেখুন না, আপনি কি-রকম যত্ন-কষ্ট করে খাওয়াচ্ছেন। তবুও যেন আপনার মনে হ'চ্ছে—আমার হয়ত তৃপ্তি হ'চ্ছে না, এই রকম মনে হ'চ্ছে না-কি?

অম্বা তরুণের মুখের দিকেই চাহিয়াছিল, কথাটি শেষ

হইবামাত্র লজ্জায় সে মুখ ফিরাইয়া লইল, একটু পরে বলিল,—সেই রকম ত মনেই হয়।

এই অপ্রিয় প্রসঙ্গ আলোচনা হইতে, নিবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যেই সে এই কথা কয়টি বলিয়াছিল, তরুণ তাহা বুঝিতে পারিল না, সে বলিল—আমিও ত তাই বল্‌ছি। বিরিজমল ত দুষ্মন্তই সেজেছিল কি-না। কাব্যে পড়া গেছে……শকুন্তলার প্রিয়সখীরা হৃদয়-দান-জেনেও রাজাকে বল্‌ছেন—অজ্জ! অসম্ভাবিদাদিসক্কারং ভূওোরি পেক্‌খণনিমিত্তং লজ্জেমো অজ্জং বিন্নাবেদুং।

অম্বা বলিল,—তার মানে কি?

তরুণ বলিল,—মানে আর কি! অনসূয়া-প্রিয়ম্বদা দুঃখ করেছেন যে, হে রাজন! রাজঅতিথিকে আমরা সবিশেষ সৎকার না করিতে পারিয়া পুনরায় দর্শন দিবেন—এ কথা বলিতেও লজ্জানুভূত হইতেছে।—এ'ত আপনাদের চেষ্টা করে করতে হয়-না কি-না—একেবারেই জাতিগত। তাতে করেই অতিথিও পুলকিত হয়ে উঠেন, আপনারাও……ঠিক এই কথাটাই সেদিন সুপ্রিয়াকে বল্‌ছিলুম!

অম্বার ইচ্ছা হইল, জিজ্ঞাসা করে সুপ্রিয়া কে! কিন্তু এখনি এমন একটা মর্ম্মন্তুদ ইঙ্গিত সে করিয়াছে, আর খোঁচাইয়া তুলিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সে তরুণের হাস্য প্রফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া, আবার বাহিরের পানে দৃষ্টিক্ষেপ করিল।

তরুণ বলিল—সেও ঠিক তোমারই মত……

অম্বা আরক্তমুখে চাহিতেই, তরুণ বলিল—আপনার মত পরায়ণা! এতে ত কোন দোষ নেই! এ ত গর্ব্বের কথা। আর কেবল আমারই সে গর্ব্ব খুব জোরের সঙ্গে করতে পারি।

সুপ্রিয়া কে?

প্রশ্ন করিয়াছিল, কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

তরুণ খাইতে খাইতে বলিল—আমার একটি বন্ধুর বিদুষী বোন্। তারা খুব এন্‌লাইটেণ্ড—আলোকপ্রাপ্তা হ'লেও আমাদের দেশের রীতি নীতিগুলি মেনেই চলে।

অম্বা জিজ্ঞাসিল—কলকাতায়?

হ্যাঁ। যদিও সে খুব বেশী লেখাপড়া শিখ্‌তে পারে নি এখনও—কিন্তু জিনিষটাকে বেশ আয়ত্ত করে ফেলেছে—মানে, সব তাতেই তাদের স্বাধীনতা থাক্‌লেও মনের গঠনও সঙ্গে সঙ্গেই হ'চ্ছে কি-না, ভাল মন্দটা খুব ভালো করেই তারা বুঝতে পারে।

অম্বা বিরসমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

তরুণ একটু থামিয়া বলিল—দেখুন, এই জন্যেই মেয়েদের লেখাপড়া শেখানর পক্ষে আমি! আমি বলি কি—ভালোমন্দ বোঝাবার ক্ষমতাটি বুঝিয়ে দিয়ে তা'দের স্বাধীনতাই দাও, আর আলোকই দাও, তারা ঠিক বেছে নিতে পারবে—কোন্‌টি ভালো, আর কোন্‌টি মন্দ। নইলে, এই আপনাকে দিয়েই দেখুন না··

অম্বার পাতলা ঠোঁটদু'টি কাঁপিয়া উঠিল, কোন কথা বলিবার

পূর্ব্বেই তরুণ এই বিষণ্ণ ভাবটি কল্পনা করিয়া, বাক্যস্রোতে পূর্ণচ্ছেদ টানিয়া দিল।

এবং সেই রাত্রে নিদ্রার পূর্ব্বে দৃঢ়চিত্তে সঙ্কল্প করিল—এখন হইতে বিবেচনা করিয়া কথা কহিতে হইবে! পৃথিবীর সব রমণীই সত্যবতী নহে; সমস্ত পর্ব্বত হিমালয় নয় এবং সমস্ত দেশই ভারতবর্ষ নয়! সহ্যের সীমা সকলের সমান নয়!

বারো

তাহার পর আর কোন কথাই হয় নাই। তরুণ সারাদিন গাড়ী লইয়া সহর ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। সিকরোলে যে দূর আত্মীয়ের গৃহে তাহার নামিবার কথা ছিল এবং অম্বার ভয়েই নামিতে পারে নাই, তাঁহাদের বাড়ীতেই দুই বেলা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছে। রাত্রি অধিক হইতে পারে, ফিরিয়া যেন অম্বাকে জাগরিত না দেখিতে হয়—এইরূপ আদেশ প্রচার করিয়াছিল, কিন্তু রাত্রে যখন ফিরিয়া আসিল, অম্বা জাগিয়াই ছিল। প্রথম সে ভাবিয়াছিল, দেখা দিবে না, কিন্তু পদশব্দ যতই নিকটে আসিতে লাগিল, অনিচ্ছা তরলাকারে ইচ্ছায় পরিণত হইয়া, তাহার পা দু'টিকে একরকম টানিয়াই বাহিরে আনিয়া দাঁড় করাইল।

তরুণ বলিল—যা ভেবেছি তাই! আচ্ছা, কথা শুনতে কি আপনি এতই ভালোবাসেন?

অম্বা হাসিয়া ফেলিল। কোন কথাই বলিল না।

তরুণও সহাস্যে কহিল—যান।—সে ঘরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। অম্বা নড়িল না, একটু ভাবিয়া বলিল—তেতলায় আপনার বিছানা করা হয় নি ত, তরুণ বাবু?

না হোক্-গে—সে আমি ক'রে নিতে পারব'খন। আপনি শুতে যান।—সে উঠিতেছে দেখিয়া অম্বা দৃঢ়স্বরে বলিল—আপনি ততক্ষণ জামাকাপড় বদলান, আমি বিছানাটা করে দিয়ে আসি। সে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই দ্রুতপদে ছাদে উঠিয়া গেল। তরুণ দুই তিন মিনিট সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। ত্রয়োদশীর চন্দ্র তখন আকাশভুবন আলোকিত করিয়া ফেলিয়াছিল,—জ্যোৎস্না বিমণ্ডিত বাড়ীখানার আলো-ছায়ার ম্লান চেহারা নিরীক্ষণ করিতে করিতে সে অন্যমনে ছাদেই আসিয়া দাঁড়াইল।

গঙ্গাবক্ষে তরণীগুলি সাদা কাঁপড়ে কালো কালো ঘুঁটি তোলার মত দেখা যাইতেছিল; ওপারে দূরে দূরে কয়েকটা মিটমিটে প্রদীপের আলোক যেন জ্যোৎস্নাভরা আকাশের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়াছিল। তরুণ একমিনিটের মধ্যে চারিদিক দেখিয়া লইয়া দ্বারের সম্মুখে আসিয়া ডাকিল,—অম্বা!

অম্বা দুইহাতে চাদরখানি বিছাইতেছিল, মুখটি তুলিয়াই নামাইয়া লইল। একমিনিট পরে বলিল,—আমার নাম অম্বা নয় কমলা!

কমলা! কিন্তু সেই প্রথম দিন····

সে আমি·····আমাকে কমলা ব'লেই জানবেন।

তরুণ ঠিক দ্বার-সম্মুখেই দাঁড়াইয়াছিল, অম্বা নিকটে আসিয়া নতমুখে দাঁড়াইল, তরুণ পথ ছাড়িয়া দিতেই সিঁড়ি নামিয়া গেল।

তরুণ ঘরে ঢুকিয়া জামা-কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে ভাবিতে লাগিল,—অম্বা কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিল না কেন? কেন সে প্রথমদিন সেই অপরিচিতা বৃদ্ধাটির কাছে মিথ্যা বলিয়াছিল, তাহার কোনরূপ সদুত্তর সে খুঁজিয়া পাইল না। নাম ভাঁড়াইবার যে কি প্রয়োজন তাহার হইয়াছিল সেই জানে! কিন্তু এই মিথ্যাভাষণের গুরুত্ব তরুণের মন ক্ষুণ্ণ করিয়া তুলিল এবং যতই ভাবে—কেমন একটা বিতৃষ্ণায় মনটি ভরিয়া যাইতে লাগিল।

অম্বাও একেবারেই নামিতে পারে নাই—সে সিঁড়ির অন্ধকারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল! সে-যে কি কষ্টেই না সেদিন মিথ্যা বলিয়াছিল সে ত জানে! এই মিথ্যাটা বলিবার কোন দরকারই ছিল না, কিন্তু এ কথা ত তাহার স্মরণ আছে যে বৃদ্ধার পূর্ব্বেকার প্রশ্নটা কি বিশ্রী হইয়াই তাহাকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল! মিথ্যা বলা ছাড়া যে অন্য কোন পথই তাহার সম্মুখে মুক্ত ছিল না—তাহাও তাহার মনে আছে!

কিন্তু তরুণ কি ভাবিল, সে কি তাহাকে ক্ষমা করিবে না? মনটি তাহার যেন সংশয় দোলায় দুলিতে লাগিল।

সে ভাবিল,—যদি এই এক অপরাধেই তরুণ তাহার সর্ব্বস্বই মিথ্যা ভাবিয়া বসে, সে ত কোন যুক্তিতর্কের দ্বারাই তাহা খণ্ডন করিতে পারিবে না! সে ত কোনদিনই মুখ ফুটিয়া তাহাকে

বলিতে পারিবে না যে 'ওগো—তোমার কাছে আর কিছুই মিথ্যা নাই'—এ কথা সে যদি না বলিতে পারিল, তাহারই বা সন্দেহ ঘুচিবে কি করিয়া !

সেই অন্ধকার সিঁড়ির মধ্যে দাঁড়াইয়া তাহার মনে হইতে লাগিল,—মিথ্যা বলার যত পাপই শাস্ত্রে উল্লেখ থাকুক, ইহার চেয়ে কঠিন আর কি হইতে পারে ? তরুণের সঙ্গে অতি ক্ষুদ্র ব্যবহারেও যে সে এতটুকু মিথ্যা আশ্রয় করে নাই এবং সেখানে যে কোন ফাঁকীই সে চালায় নাই—এ কথা কি আর সে বিশ্বাস করিবে ! সে ত নিশ্চয়ই ভাবিয়াছে—একটি অনাবশ্যক মিথ্যাও যে বলিতে পারে, প্রয়োজন হইলে ততোধিক বলিতে তাহার কুণ্ঠা হইবে কেন ? এই ভাবিয়া যদি সে অমোঘ কঠিন শাস্তিরই ব্যবস্থা করে তাহা হইলেও ত অন্যায় হইবে না।

অম্বা বসিয়া পড়িল। কতক্ষণ বসিয়াছিল, জানে না, চমক ভাঙ্গিতেই দ্রুতপদে নীচে নামিয়া ঘরে ঢুকিবে, বাড়ীর গৃহিণী বলিলেন—শিঁড়িতে কি তুমিই ছিলে ?

অন্যসময়ে তিনি তাহাকে 'বৌমা' সম্বোধন করিতেন, অম্বা ইহাও লক্ষ্য করিয়া যে আজ তাঁহার মুখভাবটি কিছু কঠোর। সে বিবর্ণ মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। গৃহিণী বলিলেন—কথা কচ্ছ না-যে !

অম্বা চুপ করিয়া রহিল।

গৃহিণী বলিলেন—কদিন থেকেই আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে যে যা বলে তোমরা এসেছ—তা নও……

অম্বা দপ্ করিয়া খড়ের আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল—কি বলে এসেছি, কি নই ?

কথা কইতে লজ্জা হয় না তোমার ? ও ছেলেটি তোমার কে ?

খড়ের আগুনের বিশেষত্বই এই, আগুন স্বল্পকালস্থায়ী—অম্বা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

জিজ্ঞেস কর দিকিন্—যখন বাড়ী নিয়েছিল, কি পরিচয় ও তোমার দিয়েছিল। কি ?—স্বামী স্ত্রী ! আমরাও ভেবেছিলুম হবেও বা ! আজকাল ত ফ্যাসান হয়েছে কলকাতায়, এই রকম হাওয়া খেয়ে বেড়ানো—এ কিছু আর দোষের নয়।

অম্বা কি বলিতে গেল, কিন্তু গৃহিণীর তপ্ত বাক্যস্রোতে তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন—কালই বাড়ী ছেড়ে দিয়ে যাবে—বুঝলে ? কাল নাগাদ-সন্ধ্যে খালি হওয়া চাই—তা বলে দিলুম, কিন্তু।

অম্বা বলিল—কেন······

গৃহিণী বলিলেন—কোন্-মুখে জিজ্ঞেস করছ আবার—কেন ? আমি সব বুঝতে পেরেছি। ও-সব এখানে হবে টবে না, বাছা। পিরীত করতে হয় ঢের জায়গা আছে। সোজা কথা—কাল······

ছেড়ে দেব—বলিয়া অম্বা ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। গৃহিণী তখনও থান-নাই, তিনি সামনের দেওয়ালটাকে উদ্দেশ করিয়াই বলিতে লাগিলেন—মরণ ! এখানে এলি কেন ? মরবার কি

আর জায়গা ছিল না। ছোঁড়াকে দেখে নেলা ক্ষেপা ভাল বলেই হত—ও-মা, একেবারে যে খুকড়ীর ভেতর খাসা চাল দেখছি।……ইত্যাদি।

অম্বা দ্রুতহস্তে হারিকেনটি নিভাইয়া দিল। নিজের চেহারার যতটা তাহার চোখে পড়িয়াছিল, সবটার এমন লজ্জাকর কৃষ্ণমূর্ত্তি এত অশোভন বোধ হইতেছিল যে সে আর আলোকের সম্মুখে নিজেকে স্থির রাখিতে পারিল না।

গৃহিণী যথেষ্ট জ্যোৎস্নালোক সত্ত্বেও দুইবার হোঁচোট খাইয়া তিনবারের বার নিজের শয্যাগৃহের দ্বারে ঠোক্কর লাগিতেই চীৎকার করিয়া উঠিলেন। অম্বার ভয় হইতেছিল বুঝি তাঁহার চীৎকার শব্দে আবার কেহ সহানুভূতি জানাইতে আসিয়া পাঁচ কথা শুনাইয়া যাইবে, তাহারই প্রতীক্ষা করিয়া অম্বা দুই মিনিট পরে সশব্দে দ্বারটি বন্ধ করিয়া দিল। কিন্তু শয্যাপ্রবেশের ইচ্ছা হইল না। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সে সারা-জীবনের ছবিটা যেন একবার স্পষ্ট করিয়া ভাবিয়া লইল। কবে কোন্ সুদূর দেশে কত মঙ্গল-শঙ্খের মধ্যে সে সর্ব্বপ্রথম পৃথিবীর আলোকে চক্ষুরুন্মীলন করিয়াছিল; বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই নারীজন্ম প্রস্ফুটিত প্রসূনের মত ধীরে ধীরে বিকশিত হইবার সঙ্গেই কোন্ এক নিষ্ঠুর স্পর্শে বৃন্তচ্যুত হইয়া লোকের ঘৃণা উপেক্ষা, নিন্দা সব সহিতে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়াছিল—সব মনে পড়িতে লাগিল।

কখন্ চিন্তাভারাক্রান্ত হৃদয়টিতে নিদ্রা বিমুখ হইয়া ফিরিয়া

গিয়াছিল, শেষরাত্রে গঙ্গাস্নান যাত্রীদের উচ্চকণ্ঠস্বরে চমকিয়া সে কুঁজার জল ঢক্‌ ঢক্‌ করিয়া পান করিয়া দুইহাতে মাথার উপাধানটিকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া শুইয়া পড়িল, বিমুখ নিদ্রা আর ফিরিল না ; ক্রমে দুটি চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল।

তরুণ ভোরে উঠিয়াই বাহির হইয়া গিয়াছিল, পদশব্দগুলি গণিতে গণিতে তাহার মনে পড়িয়া গেল—গৃহিণীর সেই কথাটা! তরুণ যে মিথ্যা বলিয়াছিল, ইহা ভাবিতেও তাহার যেমন দুঃখ ছিল, গৃহিণীর কথাটি অসত্য কল্পনা করিয়াও সে সুখবোধ করিতে পারিল না।

চিরদিন সে নিজেকে দৃঢ় এবং কঠিনই ভাবিয়া আসিয়াছিল, কাল রাত্রে তাহার দৃঢ়তা কেন-যে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, কেন সে কাঠিন্য অবলম্বন করিয়া গৃহিণীকে প্রশ্ন করিয়া এই দুইটা কথা বেশী করিয়া জানিয়া লয় নাই—এই ক্ষোভে সে নিজেকেই যেন কশাঘাত করিতে লাগিল।

অন্য দিন সে উঠিয়া কত কাজকর্ম্ম সারিয়া লইত, আজ সে শয্যাত্যাগ করিতে পারিল না। সে-যে কোনমতেই বাড়ীর গৃহিণীটির সম্মুখে কোন অছিলাতেই দাঁড়াইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারিবে না, ভাবিয়া শয্যা ছাড়িয়া উঠিতে প্রবৃত্তি হইল না।

দিনের বেলা বাড়িয়াই চলিতেছে, মূর্ত্তিমতী ঘোষজায়া তাণ্ডব নৃত্যে কতবার না ঘরের সামনের বারান্দা দিয়া আনাগোনা করিয়াছেন ; স্পষ্ট ও অস্পষ্ট বাক্যে এবং ইঙ্গিতে বেলা এবং

গৃহত্যাগের আজ্ঞাটি বিজ্ঞাপিত করিয়া গিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই, বারবার পুত্রকে ঘড়ি দেখিতে বলিতেছেন, বিছানায় থাকিয়াই অম্বা সব শুনিতেছিল। কিন্তু হয়ত পক্ষাঘাতগ্রস্ত মনটির উপর তাহার কোন জোরই ছিল না—সে উঠিতে পারিল না।

তরুণের কড়ানাড়ার সঙ্গে অন্য এক প্রচণ্ড পদশব্দ শুনিয়াই অম্বার বুক দুড় দুড় করিয়া উঠিল। পদশব্দে এত সচকিত সে আর কোন দিনই হয় নাই।

ঝট্ করিয়া দ্বার খুলিয়া দিতেই তরুণ শুষ্কমুখে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। অম্বার লাল চোখ দেখিয়া বলিয়া উঠিল—অসুখ করেছে আপনার?

অম্বা বলিল—না

তরুণ আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল—ঘুম হয়-নি বুঝি? চোখ একেবারে জবা ফুল হয়ে গেছে। যান-যান, স্নান করে আসুন।

অম্বা বারান্দার শব্দ লক্ষ্য করিয়া বিমর্ষমুখে কহিল—আপনার স্নান হয়ে গেছে?

না—হয়নি। আপনি কি স্নান করে আস্‌বেন? আমার দরকার আছে—একটু······

অম্বা বলিল···কি?

তরুণ বলিল—আজই বাড়ী যেতে হবে—আমাকে। মার চিঠি এসেছে?

এখন?

তরুণ বলিল—হ্যাঁ। চিঠি পড়েই আপনার কাছে আসছি।

অম্বা কথা কহিল না, হাতটি বাড়াইয়া দিল।

তরুণ জিজ্ঞাসিল—চিঠি?—সে ত উপরে। দাঁড়ান আনছি।

যাবেন না, শুনুন। এ বাড়ীর গিন্নী......

তাঁকেও বলা হয়-নি, এখনও। বলব এখনি।

অম্বা বলিল—আজই যেতে হবে?

নিশ্চয়ই—বলিয়া তরুণ একমুহূর্তের জন্য অম্বার পানে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল; সে-যেন একেবারে সাদা হইয়া গেছে। তাহার দুঃখ অনুমান করিয়া বলিল—আপনিও চলুন আমার সঙ্গে। আমার মাকে দেখবেন।

তাঁর কাছে?—বলিয়া সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।—সে মাটির ধূলোও কি আমি ছুঁতে পাব?

তরুণ বলিল—আপনি সেদিন বলছিলেন—আপনার মাকে মনেই পড়ে না। আপনি ত বল্লেও বুঝতে পারবেন না আমার মা কী?—কথাটা বলিয়া ফেলিয়া সে চকিতে ঘর ছাড়িয়া গেল।

অম্বা বারান্দায় রৌদ্রে তরুণের দীর্ঘ ছায়ার পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

তেরো

দুই মিনিট পরেই তরুণ ফিরিয়া আসিয়া চিঠিখানি অম্বার হাতে দিয়া বলিল—আপনি আজই তৈরী হ'তে পারবেন ত!

জবাব পাইল না, সে তখন পত্রখানার ভীষণ কঠিন ভাষাটির অর্থ করিতে মগ্ন ছিল।

"কল্যাণীয়েষু,

তুমি পত্রপাঠ মাত্র প্রত্যাগমন করিবে। একটি দিনও দেরী করিবে না। আমি প্রতি মুহূর্ত্তেই তোমার আগমন প্রত্যাশা করিয়া আছি।—তোমার মা।"

—একি পত্র!

অম্বা চিঠি হইতে মুখ তুলিয়া চাহিতেই তরুণ জিজ্ঞাসিল—যেতে পারা যাবে না সন্ধ্যের গাড়ীটাতে?

অম্বা সাড়া দিল না।

তরুণ বলিল—আপনার ত কোন হাঙ্গামাই নাই—কি বলেন? ঠাকুর-দেখা, গঙ্গায় প্রদীপ দেওয়া—কিছুই ত করলেন না কাশীতে! দেখুন, আপনার মত পাপী ভূ-ভারতে আর নেই।

অম্বা আর্ত্তের মত চাহিতেই, তরুণ সহাস্যে বলিল—জানেন ত স্বর্ণ-কাশী, মহাদেবের ত্রিশূলের ওপর কাশী—পৃথিবীর বাহিরে! এমন জায়গায় থেকেও কি-না আপনার না-হ'ল একটু পুণ্য করা,

না-হ'ল আমার মত খানিক বেড়ানো। আপনি একেবারে দু'য়ের বার—দু'য়ের বার—সে হাসিতে লাগিল।

অম্বা নির্ব্বাক্-বিস্ময়ে বসিয়া রহিল।

তরুণ হাসি থামাইয়া গম্ভীর হইয়া বলিল—আর কিছু দেখুন না-ই দেখুন—বাবা কালভৈরবটিকে একবার দেখে আসুন। নৈলে সারাজীবনে আর আপনি স্বর্ণ-কাশীতে ঢুক্‌তে পাবেন না। ভবিষ্যতে যদি বা শুভাগমন ক'রে পুণ্যার্জ্জন হ'ত সে পথটাও বন্ধ হয়ে যাবে—যান, শেষদিন একটিবার গঙ্গাস্নান করে......

আচ্ছা আপনি এত পুণ্যি পুণ্যি করেন কেন বলুন ত? আমাদের দেশেও ত আমি অনেক লোকই দেখেছি......

তারা বুঝি ও-অপকর্ম্ম করতে রাজী নয়? কি করি বলুন, স্বভাবের দোষ। হিন্দুর ছেলে......

আমরাও খৃশ্চান নই।

তরুণ হাসিয়া বলিল—আবার আপনি ভুল করলেন। রাগবার কি কথা হ'ল?......

অম্বার মনে হইল, কৈ—কোন কথাই হয় নাই ত! কিন্তু কেন যে-সে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল, কারণ বুঝিতে পারিল না। লজ্জিতমুখে, ডান হাতে দ্বারটি ভেজাইয়া দিয়া বলিল—আপনি এত হাসছেন কিসে?

হাসাটাও দোষের,—এ ত বড় মুস্কিল হ'ল দেখছি।

এই কথা কয়টির মধ্যে এতটুকু শ্লেষ-তাপ কিছুই ছিল না, কিন্তু হৃদয়কন্দরে একটা কথা ফুটন্ত তরকারীর মত চড় চড়

করিতেছিল বলিয়া অম্বার মনে হইল হাসির তুলে হয়ত কোন গোপন ব্যঙ্গ নিহিত আছে। কঠিন স্বরে বলিল—যাবার পথে আমাকে বাড়ী রেখে যেতে পারবেন না?—বলিয়া সে তরুণের মুখের দিকে চাহিল।

তরুণ বলিল—বাড়ী-ই যাবেন? বেশ,—রেখে যাব।

দেরী হ'য়ে যাবে না?

হবে বৈ-কি দেরী, একদিন ত হ'বেই,—তা হ'ক। তাতে কিছু ক্ষতি নেই।

অম্বা চিঠিখানি তুলিয়া ধরিল।

তরুণ বলিল—তাতে এসে যাবে না।—আজই বেরুবেন তো?

হ্যাঁ—বলিয়া অম্বা দ্বারটি খুলিয়া বাহিরে যাইতেছিল, তখনই কি ভাবিয়া ফিরিল। নিম্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসিল—বাড়ী যেদিন ভাড়া নিয়েছিলেন—ওঁদের কিছু বলেছিলেন?

তরুণ প্রশ্নটি সম্যক্ বুঝিতে পারে নাই, সে সহজভাবেই বলিল—কি-বলুন ত? একমাসের ভাড়া:.....

না, না—আর কিছু?

তরুণ মনে মনে ভাবিয়া বলিল—কৈ, আর ত কিছু মনে পড়ছে না। কি ব'লতে পারেন? পারেন না?—কার কাছে শুনেছেন, তাই বলুন অন্ততঃ—

অম্বা বাহিরের দিকে মুখ করিয়া বলিল—আমাদের সম্বন্ধে!—কথাটা একটু খোলসা করিয়া বলিবারই ইচ্ছা ছিল কিন্তু কে-যেন

সবলে কণ্ঠরুদ্ধ করিয়া দিল। একমিনিট পরে মুখ ফিরাইতেই দেখিল, তরুণ অন্যদিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছে।

কৈ—কিছুতো মনে করতে পারলুম না।……

বারান্দায় পদশব্দ শুনিয়া তরুণ বাহির হইয়া গেল; অম্বাও আসিতেছিল, মধ্যপথ হইতে ফিরিয়া গেল।

তরুণ একমাসের পুরাভাড়া দিয়া গিন্নীর চরণে প্রণাম করিয়া বলিল—আবার এখানেই এসে উঠবো, মা।

গৃহিণী ঘোমটার ভিতর হইতে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলিলেন, বুঝা গেল না, কিন্তু অদূরে দাঁড়াইয়া অম্বা বিশীর্ণমুখে সেই অস্পষ্ট শব্দগুলি গ্রাস করিতেছিল। তরুণের পর কোনমতে একবার ভূতলে মাথা ঠেকাইয়া দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেল। গাড়ীতে উঠিতেই তাহার মনে হইল, সে-যেন একটা খুন করিয়া আসিয়াছে।

আসিবার দিনের নীরব অভিনয় চিত্রটি দুজনেরই চিত্তপটে ফুটিয়া উঠিল। অতীত দিনের কঙ্কালসার একটা দীন মূর্ত্তি মনে পড়িতেই তাহা অবহ অসহ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

এই অসহ ভারপীড়িত হইয়া তরুণ নীরবতার কারাপ্রাচীর ভেদ করিয়া বলিল—সহরটাই দেখে নিন্—আর কিছু ঘটল না ত!

আবার সেই পরিহাস! এবার আর অম্বা রাগ করিল না; চেষ্টাকৃত একটু হাসিয়া চোখ-দুটি খড়খড়ির ছিদ্রসংলগ্ন করিয়া দেখিতে লাগিল।

ট্রেণ আসিতে বিলম্ব ছিল না, তরুণ তাহাকে সেই কালা-আদমীর ঘরে বসাইয়া টিকিট কিনিয়া আনিয়া হাসিহাসিমুখে

বলিল—ক'দিন আগে এইখানেই নেমেছিলুম নয়? হাঁ হাঁ—ঐ যে ঐ দরজাটি দিয়ে বেরিয়ে গাড়ীভাড়া করা হ'য়েছিল, না?

অম্বা কেবল একটি হাঁ বলিল।

তরুণ থামিল না; সোৎসাহে বলিল—বেশ জায়গাটি কিন্তু ছাড়তে মায়া হয়। না?

এবারকার প্রশ্নের জবাব দিতে তাহার সঙ্কোচ ছিল না, অম্বা হাসিয়া বলিল—সে কি ঠাকুরদেবতার জন্যে?

সে-যাই কেন হ'ক না......

এই সময়ে কাঁধে, বগলে ও হাতে ছেলে এবং পুঁটুলী সমভাবে বহিয়া এক পক্ককেশ বৃদ্ধ একবার পার্শ্বের শালাবৃত স্থূলকায় স্ত্রীলোকটির, একবার তরুণের মুখের পানে চাহিয়া কড়মড় করিয়া বলিল—সরুন ম'শাই। এটা মেয়ে-জায়গা।

তরুণ নিঃশব্দে সরিয়া গেল; একটু আশ্চর্য্য হইলেও বৃদ্ধের পোঁটলা-পুঁটলী এবং ছেলেপুলের ভারের দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল। বৃদ্ধের দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া আরও দুই-তিনটা লোক তরুণকে লক্ষ্য করিতেছিল।

নিজের মনে অন্যায় না বুঝিলেও সে যে বৃদ্ধের চাহনিটার অর্থ করিতে পারে নাই; তাহা নহে। এক ত কাশী ষ্টেশনে যাত্রীর সংখ্যা অত্যন্ত অল্প (অধিকাংশ লোক ক্যাণ্টনমেণ্টে উঠা-নামা করিয়া থাকেন) এবং কালা আদমির জেনানা লোকের ঘরটা সম্পূর্ণ অনধিকৃত দেখিয়া সে দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া গাড়ীর অপেক্ষা করিতে করিতে নিশ্চিন্তমনে কথা কহিতেছিল—এখন এই লোক-

গুলির মিলিত দৃষ্টিটা তাহার চোখ ফুটাইয়া বলিয়া দিল—
ইহাপেক্ষা অন্যায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই হইতে পারে না।

গাড়ী আসিতেই মধ্যমশ্রেণীর স্ত্রী-কামরায় অম্বাকে তুলিয়া দিয়া নিজে পাশের গাড়ীটাতে উঠিয়া পড়িল।

চোদ্দ

ব্যাণ্ডেল জংসন ষ্টেশনে নামিয়া আবার একটা জেনানা-কামরায় অম্বাকে পুরিয়া দিয়া, তরুণ প্ল্যাটফরমে বেড়াইতে লাগিল। লোকের সংখ্যা খুব বেশী হয় নাই, গাড়ীর প্রায় দেড়ঘণ্টা দেরী। পশ্চিমমুখে আর দুইখানি গাড়ী যাইবে, পারাপারের খেয়া গাড়ীটা আসিবে, ছাড়িবে, তাহার পর কাটোয়ার ট্রেণ। রেল কোম্পানীতে যে মাথা-ওলা মানুষের অত্যন্ত অসদ্ভাব, গাড়ীর বে-বন্দোবস্তটা কালা আদমীদের পক্ষেও কষ্টকর, একটা সাহেব-বাস ষ্টেশন হইলে কিরূপ হইত—এই সমস্ত আলোচনা করিতে করিতে সে পায়চারি করিতে লাগিল।

জেনানা-কামরার সম্মুখে আসিতেই অম্বা চক্ষু-ইঙ্গিতে তাহাকে ডাকিয়া বলিল—এই দু'টো তিনটে ষ্টেশন একটা উঁচু কেলাসে যাওয়া যায় না।

তরুণ বলিল—যায় বোধ হয়! কেন?

অম্বা বলিল—তাহ'লে সুবিধে হয়।

আচ্ছা দেখি,—বলিয়া সে টিকিটঘরের উদ্দেশে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিতে লাগিল। একটু পরে, সে নিজের মনে স্বীকার করিতে বাধ্য হইল, চিরদিন সংস্কৃত তাহার নিত্যপাঠ্য হইলেও মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানে সে-যেন আপনা-আপনি সুবিদ্বান হইয়া উঠিয়াছে। অম্বা যে কেন ট্রেণে মধ্যম শ্রেণীতে যাইতে রাজী নহে—তাহাও সে বুঝিল।

এ সম্বন্ধে তাহার মনে অনেক চিন্তাই জন্মিয়াছিল। সে-যে কেমন করিয়া দেশে ফিরিবে জানিতে তাহার একটা বিষম কৌতূহল হইয়াছে, অম্বার পিতা—যিনি সেই চিঠিখানা লিখিয়াছিলেন—তিনি যে সানন্দে দুহিতার হাত ধরিয়া তুলিয়া লইবেন না জানিয়াও অম্বা যে কেন সেইখানেই মাথা রাখিতে তৎপর হইয়া উঠিয়াছে,—ইহাও অল্প বিস্ময় নহে।

বিস্ময় যত বড়ই হোক, ইহার আশে-পাশে যে একটা মুক্তির স্বাচ্ছন্দ্য বিরাজ করিতেছিল, তাহারই অনুকূল বায়ুতে তরুণের মনের বোঝা অনেক হালকা হইয়া গেল।

একখানি মাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা ছিল, অম্বাকে তুলিয়া দিয়া নিজেও তন্মধ্যে উঠিয়া বসিয়াছিল। গাড়ী ছাড়িতেই অম্বা বলিল—কি ভাবছেন তরুণ বাবু?

তরুণ যে বিশেষ কিছু ভাবিতেছিল, এমন নহে, কিন্তু অম্বার এই আকস্মিক প্রশ্নে সে-যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

অম্বা তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিল—আজ এ কুগ্রহ থেকে নিষ্কৃতি পাবেন—এই ভাবছেন, নয়?

তরুণ লজ্জিতমুখে বলিল—না, না—

অম্বা অল্প হাসিয়া বলিল—সে ত ভাব্‌বারই কথা।

অম্বার হাতে তখনও সেই বহিখানিই ছিল, তরুণ তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল—এখনও শেষ হয় নি না-কি? কাল বিকেলে দিইছিলুম যে গাড়ীতে।

অম্বা বহিখানির পাতায় চোখ রাখিয়া বলিল—একবার হ'য়ে গেছে।

ভাল লেগেছে তাহ'লে?

নইলে কি কেউ দু'বার করে পড়ে?—অম্বা একটুখানি হাসিয়া বলিল,—এ মেয়েটির অবস্থাও ঠিক আমারই মত' হয়েছিল না?

তরুণ প্ল্যাটফরমে লোক-চলাচল দেখিতেছিল, উত্তর দিল না।

অম্বা বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিল—কোন্ ষ্টেশন—এ?

তরুণ এধারে নাম-ফলকটি পাঠ করিয়া বলিল—ত্রিবেণী, ই, আই আর।

এর পরের ষ্টেশন খামারগাছী।

ওঃ—বলিয়া তরুণ ষ্টেশন বেড়ার বাহিরে দুইটি গরুর লড়াই দেখিতে লাগিল।

কেহ কিছুক্ষণ কোন কথা কহিল না। কথা কহিবার মত শক্তি বোধ করি কাহারই ছিল না। একজন তখন সম্মুখে ভীষণ দৃশ্য কল্পনা করিয়া মুহ্যমান ভাবে বসিয়াছিল, আর একজন তাহারই মনের দ্বন্দ্ব ভাবিয়া মুহুর্মুহু অস্বস্তিতে ভরিয়া উঠিতেছিল।

গাড়ীর বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিল; লাইনের ধারে

সিগন্যালের লৌহ মঞ্চ দেখা গেল—অম্বা বলিল—তরুণ বাবু!

তরুণ নিঃশব্দে তাহার পানে চাহিল।

একটা কথা বল্‌ব?

বলুন—না।

আপনি নিজে আগে একবার হাতকান্দায় যাবেন?

তরুণ একমিনিট ভাবিয়া লইয়া বলিল—তা যাব, কিন্তু আপনি কোথায় থাকবেন? ওয়েটিংরুমে? এ ষ্টেশনটায় আছে ওয়েটিংরুম?

আছে। আপনি বাবার সঙ্গে দেখা করে……

বুঝেছি। গাড়ী থামিয়াছিল, তরুণ দু'একবার কুলী কুলী করিয়া ডাকাডাকি করিয়া কাহাকেও না পাইয়া নিজেই মোট-মাটরা নামাইয়া ফেলিল।

ছোট্ট একটি ষ্টেশন—প্ল্যাটফরমও নাই। তরুণ অম্বাকে ওয়েটিংরুমে বসাইয়া ষ্টেশন মাষ্টারের সঙ্গে দেখা করিল এবং যাহাতে অম্বা সেখানে সুরক্ষিতভাবে থাকিতে পারে, এইরূপ অনুরোধ করিয়া সে চলিয়া গেল।

দুইখানি মাত্র কাঠের বেঞ্চ, একটি কাঠের পর্দ্দা এই ছিল ঘরখানির আসবাব। অম্বা প্রথমে বেঞ্চখানিতেই বসিয়াছিল, কিন্তু তাহার চেরা কাঠগুলি পিঠে ফুটিতে লাগিল বলিয়া সে তরুণের বিছানা হইতে একখানি সতরঞ্চ টানিয়া লইয়া ভূতলে বিছাইয়া শুইয়া পড়িল।

বর্ষাপ্লাবিত নদীর ঘূর্ণির মুখে নৌকা পড়িলে নাবিকের এবং

আরোহীর যে অবস্থা হয় তাহার শরীর মনের ঠিক সেই অবস্থাই দাঁড়াইয়াছিল। 'পল্লীগ্রামের কোন অধিবাসীই যে তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিবে না, ইহা ত সে জানে, তাহাদের লেলিহান রসনা যে কি উগ্র বিষ উদ্গীরণ করিবে তাহাও তাহার মনশ্চক্ষে ফুটিয়া উঠিতেছিল, তথাপি কি দুর্নিবার বলেই না সে এই পথই আকর্ষণ করিতেছিল, আর কেহ না জানিলেও সে ত তাহা জানে। তরুণের আহ্বান যে কি দারুণ বেদানাভারেই সে প্রত্যাখান করিয়াছে তাহাও মনে পড়িতে লাগিল। তরুণের জননীর সম্মুখে যে কোন মতেই এই ঘৃণিত দেহটাকে টানিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না, ইহা স্থির করিতে ত তাহার অল্প ব্যথা বাজে নাই।

ঘণ্টা দুই পরে তরুণ ঘরে ঢুকিয়া বলিল—সব ব্যর্থ হল, অম্বা, তোমার বাবা দেশে নেই।

অম্বা বিবর্ণ হইয়া উঠিয়া বসিল।

তরুণ বলিল—দেশের লোক বল্লে তিনি বাউল হ'য়ে কোথায় চলে গেছেন। কেউ সন্ধান দিতে পারলে না।

অম্বা রুদ্ধশ্বাসে বলিল—তাঁর মেয়ে?

একমিনিট তাহার মুখের পানে চাহিয়া তরুণ বলিল—বল্লে তারা, মেয়েকে নিয়েই গেছে। একটা খোট্টা ছিল, সেও তালাচাবি বন্ধ করে চলে গেছে—কাপড় চোপড়ও সব নিয়ে গেছে।

অম্বা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, বলিল—এই কথা শুনলেন?

হ্যাঁ।—একটু পরে বলিল—এই বারই ত বিষম সমস্যা।

সমস্যা! হ্যাঁ, তাই বৈ-কি!—চিন্তিতমুখে কথা কয়টি বলিয়া

অম্বা বাহিরের রৌদ্র ঝলকিত ষ্টেশনের লালকঙ্করময় পথের দিকে. চাহিয়া রহিল।

তরুণ বলিয়া উঠিল—কি করবে অম্বা? যাবে আমার সঙ্গে?

কোথায়?

আমার মা'র কাছে।

অম্বা দুইতিন মিনিট উত্তর দিতে পারিল না, শেষে বলিল—আপনি পারবেন—নিয়ে যেতে?

কেন পারব না? আমি পথে আস্‌তে আস্‌তে তাই ঠিক করে ফেলেছি। চল—আমার সঙ্গে।

অম্বা কথা কহিল না। এই প্রস্তাব যে, তখন তাহার পক্ষে কত কামনার—তাহা বুঝিলেও মনখানির বিষণ্ণতা একটুও দূর হইল না। অবিচলিত মৃদুস্বরে বলিল—এখন আমি এখানেও থাকতে পারি।

তরুণ বলিল—কি করে পারেন? আপনার বাবা ত নেই এখানে?

অম্বা বলিল—না-তা নেই। কিন্তু....

তাহাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া তরুণ বুঝিল, কোন্ কথাটি বলি-বলি করিয়াও তাহার মুখে বাঁধিতেছে।

আজ না-কি সে অম্বাকে মাতৃ-আশ্রয়ে লইয়া যাইতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছে তাই সাহস করিয়া বলিল—আপনি বুঝি নিন্দা অপবাদের কথাটাই ভাবছেন! তাই নয় কি?

অম্বা কথা কহিল না।

তরুণ বলিল—সে ভয় না হয় নাই রইল। আর সত্যিই নিন্দা স্থায়ী হ'তে পারে—এমত কাজত কিছু করেন নি আপনি...

করি নি ?

অন্ততঃ আমি তাই মনে করি। কিন্তু সে কথা ছেড়ে দিলেও অন্য চিন্তা ত আছে ! কার ভরসায় এখানে থাকবেন আপনি ? ওঃ—সেই টাকাগুলো আপনার আছে বটে, কিন্তু......

অম্বা দীপ্ত কণ্ঠস্বরে বলিয়া উঠিল—টাকা নেই। কাশীর গঙ্গায় সে বাক্স আমি পুলের উপর থেকে ফেলে দিয়েছি।

ফেলে দিয়েছেন ! অনেক টাকা ছিল ত তা'তে !

তা ছিল। সে টাকা কি আমার ?—বলিয়া সে দীপ্ত-নেত্রদু'টি—তরুণের মুখের উপর স্থাপিত করিল।

বিস্ময়ে—আনন্দে তরুণের মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, সে অনুনয় পূর্ণস্বরে কহিল—তবে আর কি ! চলুন......

কখন্ গাড়ী ?

কি জানি ! ষ্টেশনে ত একটি লোকও দেখলুম না, একখানা টাইম টেবলও ত টাঙ্গানো নেই ! ও-হ, আমার ট্রাঙ্কটার ভেতরে আছে !—সে পকেটে চাবি খুঁজিতে লাগিল।

অম্বা মৃদু হাসিয়া বলিল—এই নিন্ আপনার চাবী।

তরুণ বিস্মিত হইয়া বলিল—আপনার কাছে গেল কি করে ?—সে চাবিটি লইয়া ট্রাঙ্ক খুলিতে লাগিল।

কাল কাশী ষ্টেশনে তোরঙ্গ তুলে দিয়ে আপনিই চাবী দিয়েছিলেন, আমাকে বই বের করে নিতে। মনে পড়ছে না ?—

চাবিটা দিয়েই আপনি পাশের গাড়ীতে উঠে পড়লেন। আপনিও চান-নি, আমিও ভুলে গেছি। একটু থামিয়া বলিল—সব ঠিক আছে ত!

তরুণ খোলা-তোরঙ্গের কাপড়-চোপড় হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল—তার মানে! আমার ত এমন অমূল্য সম্পত্তি কিছু ছিল-না অম্বা, যে খোওয়া যাবে।

তাহার ক্ষুণ্ণস্বরে অম্বা ব্যথা অনুভব করিয়া বলিল—তা নয়—

নয় কেন, অম্বা! আমি যে অতি দরিদ্র সে কথা ত কোন-দিনই আমি গোপন করিনি তোমার কাছে! দরিদ্র বলে কোন-দিনই আমার এতটুকু ক্ষোভ নেই অম্বা।

অম্বা যেন ভিজা কথাগুলি নিজের বুকের বসনে মুছিয়া তুলিয়া লইতেছিল। তরুণ টাইম-টেবলখানি বাহির করিয়া পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিল, দেখ, পৃথিবীতে আমার এক-মা ছাড়া আর কেউ নাই। এই মা-ছেলের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের সংসারে আর পাঁচটি প্রাণী থাকলে হয়ত আমার ভাবনার বিষয় হ'ত কিন্তু কেউ নেহ,—এক-মা। তিনি আমার কাছে আর কিছুরই প্রত্যাশা করেন না—ধন-দৌলতের আকাঙ্ক্ষা কোন দিনই মার আমার নেই। আমার কাছে একটি জিনিষ চান তিনি—সে আমার মনুষ্যত্ব! অম্বা, এ ছাড়া তিনি কিছুই চান না, চাইলেও ছেলের কাছে পেতেন কি-না তা'ও জানেন না। তবে সে চাওয়া চাওয়ির সব শেষ ঐখানে হ'য়ে চুকেছে বলেই আমিও নিশ্চিন্ত।

অম্বা কতক শুনিতেছিল, কতক শুনিতেও পাইতেছিল না। কিন্তু এটি তাহার মন ঠিকই বুঝিয়াছিল যে কাশীতেও এই প্রস্তাবটি করিবার সময় তরুণ কেমন উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। তরুণ কথা শেষ করিয়া যখন টাইম-টেবলে মন দিল, অম্বার মনে হইতে লাগিল—ঘরটার ভিতরে তখনও যেন গম্ গম্ করিতেছে এবং এই সুস্থ ও সবল দেহ যুবাপুরুষটির মহীয়সী মাতৃমূর্ত্তি ধীরে ধীরে অশ্রুজলের ভিতর দিয়াই তাহার চক্ষে ভাসিয়া উঠিতেছে।

সে মূর্ত্তি কেমন, সুন্দর কি কুৎসিত, কঠোর কি কোমল, স্নেহপূর্ণ অথবা নির্দ্দয় এ সকলের কোন চিন্তাই তাহার হইল না, সে একেবারে দু'টি হাত বাড়াইয়া অশ্রুভরা কণ্ঠে বলিল—আমাকে নিয়ে চলুন, তরুণবাবু!

তরুণ সস্নেহে তাহার হাত দুটি সরাইয়া দিয়া বলিল—তাই ত যা'ব অম্বা! তুমি কিছু ভেবো না, সেখানে পৌঁছুতে পারলেই আমরা নিশ্চিন্ত হ'ব।

সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—তিনটের আগে গাড়ী নেই। দেখি কাছে কোথাও যদি বাজার-টাজার থাকে—কিছু খেতে ত হ'বে—উপোস্ করার অভ্যাস নেই—বলিয়া হাসিয়া ফেলিল।

অম্বা বলিল—দেরী করো না……

তরুণ একবারমাত্র তাহার পানে চাহিয়া বলিল—না দেরী করব কেন? তোমার ত দেশ—জান এখানে বাজার আছে কোথাও কাছাকাছি?

অম্বা নতমুখে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—সে জানে না।

এমনই ষ্টেশন—একটা লোকেরও দেখা পাবার যো নেই—বলিয়া সে বাহির হইয়া যাইতেছিল, ফিরিয়া বলিল—দেখ, মা'র সামনে আমাকে তুমি আপনিই বলো।

অম্বা মৃদু কণ্ঠে বলিল—আচ্ছা।

পনেরো

সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীখানা গলির সম্মুখে থামাইয়া তরুণ নামিয়া পড়িতেই দেখিল, দরজাটি খোলাই আছে। সে দ্রুতপদে উঠিয়া মাকে প্রণাম করিয়া উঠিতেই মা বলিলেন—গাড়ী করে এলি ?

হ্যাঁ—অম্বা আছে সঙ্গে।

সেই মেয়েটি ?

তরুণ সত্যবতীর বিষণ্নমুখে চাহিয়া বলিল—বলছি সব।

সত্যবতী তাহার পূর্ব্বেই নীচে নামিয়া দ্বারের ফাঁকে মুখ বাড়াইয়া বলিলেন—নেমে এস মা।

অম্বার পাদু-টির শক্তিলোপ পাইয়াছিল, সে জোর করিয়া পা দুটি টানিতে টানিতে উঠিয়া আসিল। সত্যবতীর নিকটে আসিয়া মাথা নত করিয়া প্রণাম করিল। সত্যবতী তাহার মস্তক স্পর্শ করিলেন মাত্র—কিছু বলিলেন না।

এক মিনিট পরে সত্যবতী অম্বার হাত ধরিয়া উপরে উঠিয়া সস্নেহে বলিলেন—তোমার কথা একটু একটু শুনেছি আমি

তরুণের চিঠিতে। শুনে অবধি কি-যে ভাবনা হ'য়েছিল, তা' আর কি বল্‌ব।

সেই ক্ষুদ্র পত্রখণ্ডের কথা অম্বার মানসপটে ফুটিয়া উঠিল, সে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তরুণ একটি চিরুণী দিয়া মাথার ধূলাবালি ঝাড়িতে ঝাড়িতে ঘরে ঢুকিয়া বলিল—মা একটু ঘুরে আসি আমি।

মা স্নেহহাস্যের সহিত বলিলেন—এখনি আবার কোথায় ঘুরতে যাবি ?

দেখা শুনো করে আসি—বলিয়া সে নামিয়া গেল।

ছেলের কাণ্ড দেখলে একবার ? বলিয়া সত্যবতী অম্বার মুখের পানে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন। একটু পরে বলিলেন—কালই বেরিয়েছিলে তোমরা কাশী থেকে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। কালই আপনার চিঠি পেয়ে......

তরুণ খুব ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছিল না ? আমারও সেই ভয় হ'য়েছিল। এখানে আমার বিপদও বড় কম যায় নি। তরুণের যে বুড়ো পিসীকে সে রেখে দিয়ে গেছ্‌ল, তিনি তাঁর দেশের চিঠি পেয়ে পরশুই চলে গেলেন—এই নির্বান্ধব পুরীতে একলা কি আমি থাকৃতে পারি ? কাজেই তরুণকে ফিরে আস্‌তে লিখ্‌তে হ'ল।

অম্বার মনে হইল সে ইঁহার বিরক্তি কল্পনা করিয়া মিথ্যা কষ্ট পাইয়াছিলাম। একটি আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—কাল সকালে আপনার চিঠি পেয়েই বিকেলের গাড়ীতে আসা হ'ল।

সত্যবতী নিজের মনেই বলিলেন—একটি ছেলে নিয়ে বাস করা যে কত কষ্টের তা' আমিই জানি ; মা ! ছেলেবেলা থেকে ও আমার কাছে খুব কমই ছিল, সে সহ্য হ'য়ে ছিল ; এখন কিন্তু আর পারি না। এই যে দু-দিনের জন্য বেড়াতে গেছল ও, নিশ্চিন্ত মনে বেড়াতে দিতে পারলুম কৈ ?

অম্বা কথা কহিল না। এই স্নেহময়ী রমণীকে অন্যরূপ কল্পনা করিয়া সে অযথা দুঃখভোগ করিয়াছিল, এখন শ্রদ্ধায় ভক্তিতে তাহার চিত্ত নত হইয়া পড়িতেছিল। সে যে একান্ত নিরুপায় হইয়াই এখানে আসিয়াছে এবং এখানে সে চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে না—এ কথাও যেমন তাহার মনে হইতেছিল—থাকিতে পাওয়াটা একেবারেই আশ্চর্য্য অসম্ভব নয়—ইহা ভাবিয়াও সে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে স্বস্তি অনুভব করিতেছিল।

এই ক্ষুদ্র কক্ষের ছোট খাট ভাঙ্গাচোরা আসবাবগুলি পর্য্যন্ত এই গৃহস্বামী এবং তাহার জননীর মত অনাড়ম্বর, সরল এবং স্নেহ নিষিক্ত বলিয়াই তাহার মনে হইতে লাগিল।

সত্যবতী তাহার তন্ময়তা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—কি ভাব্‌ছ অম্বা ?

অম্বা উত্তর দিতে পারিল না। সত্যবতী বলিলেন—যাও মা, হাত মুখ ধুয়ে ফেল। কলে জল আছে এখনও।

সত্যবতী একটু থামিয়া, আবার বলিলেন—যাও কাপড় চোপড় ছেড়ে ফেল মা। দুঃখের ছোট ঘর-সংসার আমার, দেখতেই পাচ্ছ ত !

অম্বা কথা কহিল না। সত্যবতী জিজ্ঞাসিলেন—খাওয়া দাওয়া কি হ'য়েছিল ?

সামান্য জল খেয়েছিলুম। সিজের বাজারে, বেশী কিছু পাওয়া যায় নি। একটু থামিয়া আবার বলিল—আমি যা-ও বা খেয়ে ছিলুম কিছু, উনি ত খানই নি।

সত্যবতী বলিলেন—আবার এসেই বেরিয়ে গেল! খাবার কথাটা কোনদিনই তরুণের কাছে দরকারী ব'লে মনে হয় না!

অম্বা বলিল—হ্যাঁ, আমিও সে-কথা সেদিন বল্‌ছিলুম...

সত্যবতী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—কি বলেছিলে ?

অম্বা বলিতে লাগিল—বলেছিলুম যে এই যে নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, কাশীতে ঠাকুর দেখে বেড়াচ্ছেন কেবল, এতে শরীর থাক্‌বে কি-করে ?

ও-কি খেত না না-কি কাশীতে ?

প্রথম দু'টো দিন সেই রকমই কেটে ছিল, পরে আমি সব যোগাড় করেছিলুম।

সত্যবতী আর কিছুই বলিলেন না; আরও দুই তিনটি প্রশ্ন জাগিয়াছিল, কিন্তু কৌতূহল বেশী হইয়াছিল বলিয়া কোন মতেই প্রকাশ করিতে পারিলেন না।

যাও হাত মুখ ধুয়ে ফেলগে,—বলিয়া তিনি তরুণের পরিত্যক্ত জামা ও চাদরটি হাতে করিয়া নামিতে লাগিলেন। অম্বা তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া নামিয়া আসিয়া বলিল—আপনি কি একলা মা ?

সত্যবতী শুনিতে পান নাই, ফিরিয়া বলিলেন—কি বল্‌ছ ?

অম্বা পুনরাবৃত্তি করিল। সত্যবতী মৃদু হাসিয়া বলিলেন হ্যাঁ।

অম্বা কলের জলে গামছাখানি কাচিতে কাচিতে বলিল—আপনিও কাপড় কাচবেন ?

সত্যবতী বলিলেন—না, কাপড় চোপড় কাচা আমার হ'য়ে গেছল। গলিতে গাড়ী ঢুক্‌তেই আমি বুঝতে পেরেছিলুম তোমরা আস্‌ছ ?

অম্বা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিল—আমি আস্‌ছি—

সত্যবতী বলিলেন—হ্যাঁ, আমার ছেলে ত নবাব নয় যে হাওড়া ষ্টেশন থেকে গাড়ী করে আসবে! গরীবের ছেলেকে গরীবের মতই থাক্‌তে হয় মা।

অম্বা কথা কহিল না। সে কলের নীচে বসিয়া পড়িল। জলের বেগ মন্দ হইয়া ক্ষীণ রেখাকারে তাহার গায়ে পড়িতেছিল, অম্বা বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল—যত স্ত্রীলোক সে দেখিয়াছে, কাহারও সহিত সত্যবতীর কোন মিল নাই। তাহার মনে যে ভয়-ও একটু ছিল না, তাহা নহে। তবে ভয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সৌম্য শান্ত মূর্ত্তিতে এমনি একটা স্থির পবিত্রতা বিরাজ করিতেছিল যাহা তাহার শ্রদ্ধাই আকর্ষণ করিয়াছিল।

সত্যবতী বলিলেন—বেশী জল ঘেঁটো না, নতুন জায়গা সহ্য না-ও হ'তে পারে।

অম্বাকে স্বহস্তে খাবার খাইতে দিয়া সত্যবতী তাহার সম্মুখে বসিয়া বলিলেন—সারাদিন খাও-নি, কত কষ্ট হ'য়েছে—খেয়ে ফেল।

অম্বা বলিল—তিনি ত এখনও খেলেন না ?

কে—তরুণ!—সে কি এতক্ষণ না খেয়ে আছে? কোন্ বন্ধুর বাড়াতে উপদ্রব করে খেয়ে নিয়েছে।

অম্বা আর দ্বিরুক্তি করিল না। সে খাইতে বসিল।

এক সময় সত্যই কথা উঠিল। সত্যবতী শান্ত সংযত কণ্ঠে কহিলেন—তোমার নামটি কি? অম্বা! অম্বাই ত! এরকম নাম কখনও শুনেছি বলে মনে হয় না ত!

অম্বা প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল, কি ভাবিয়া বলিল—হ্যা।

গুটিকত কথা জিজ্ঞেস করব—বলবে কি?

অম্বা ঢোঁক গিলিয়া বলিল—বল্‌ব।

তরুণ লিখেছিল তুমি অসহায়। তোমার আত্মীয় স্বজনও কেউ ছিল না...

অম্বা বলিল—কাশীতে কেউ ছিল না।

সত্যবতী বলিল—কার সঙ্গে গেছ্‌লে তুমি?

অম্বা বিচলিত হইয়া পড়িল, কিন্তু সে হৃদয় মন সংযত করিয়া বলিল—একটি লোকের সঙ্গে গেছ্‌লুম।

একমুহূর্ত্ত পরে সত্যবতী জিজ্ঞাসিলেন—সে লোকটি কে অম্বা?

অম্বা নতমুখে নতকণ্ঠে জবাব দিল—তাঁর সঙ্গে আমার...

সে চুপ করিতেই সত্যবতী বলিয়া উঠিলেন—কি! তোমার সম্বন্ধ হয়েছিল?

অম্বা ঘাড় নাড়িল।

সত্যবতী দুই তিন মিনিট কি ভাবিলেন; বলিলেন—বুঝতে

পারলুম না অম্বা, যে সে কেমন করে হ'তে পারে'! শুনেছি, বাড়ীতে তোমার বাবা আছেন, তিনি......

অম্বা অসহায় ভাবে বলিল—তাঁকে জানিয়ে যাই নি।

সত্যবতী ত্রস্তে বলিয়া উঠিলেন—জানিয়ে যাও নি?

অম্বা আর উত্তর দিতে পারিল না। সে ঘাড়টি নীচু করিয়া বসিয়া রহিল।

সত্যবতী বলিলেন—তা, বিয়ে হ'ল না কেন?

অম্বা বলিল—তিনি মারা গেছলেন?

সত্যবতী কম্পিতস্বরে বলিলেন—মারা গেছলেন? কোথায়? কাশীতে? নয়! তবে?

রাস্তায় ট্রেণে কাটা পড়েছিলেন—আমরা পরে শুনেছিলুম।

সত্যবতী তাহার কণ্ঠস্বরে অশ্রুবেগ কল্পনা করিয়াই বলিলেন—আহা!

অম্বা মুখ তুলিয়া চাহিতেই তিনি আবার বলিলেন—তাইত তরুণের যেদিন চিঠি পেলুম যে সে অসহায় বিপন্নের সাহায্য করতে পেরেছে—জেনে আমি সুখীই হয়েছিলুম।

এই সময়ে খট্ খট্ করিয়া সদর দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল। সত্যবতী উঠিয়া পড়িলেন। বলিলেন—বস, আমি দোর খুলে দিয়ে আসি।

তিনি প্রস্থান করিতেই অম্বা কাঁদিয়া ফেলিল। জীবনভোর সে-যে কেবল দুঃখের ইতিহাসই রচনা করিয়া আসিয়াছে—মনে পড়িতেই অশ্রুরোধ করা অসাধ্য হইয়া পড়িল। জীবনের

অতীত দিনের যত কথা মনে আছে, পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে —সে কাশীর শেষের দুইটি দিনমাত্র ভীষণ সঙ্কটে পড়িয়া থাকিলেও একটি সুখ-ছায়া অনুভব করিয়াছিল—তাহাও বুঝিতে পারিল। হৃতগৌরব অনেকের কাছেই সু-প্রিয়, সেও বক্ষ মধ্যে এই সুখ-চিন্তাটি চাপিয়া ধরিয়া মাতা পুত্রের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

পাঁচ মিনিট পরে তরুণ একাকী ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল—জল খেয়েছ শুনলুম, একটু শুয়ে পড়-না।

না—আমি নীচে যাই। মা কোথা ?

তরুণ প্রফুল্লকণ্ঠে বলিল—ভাব হ'য়ে গেছে ? আমিও তাই মনে করছিলুম,—বলিয়া সে হাসিতে লাগিল। অম্বা ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল।

ষোল

সত্যবতীর ভাবে ভাষায় আকারে ইঙ্গিতে-একবারও স্নেহের অভাব ঘটে নাই। পৃথিবীর মানব চরিত্রের অভিজ্ঞতা তাহার বেশী ছিল না, পল্লীগ্রামে দুই চারিটি পুরুষ বা রমণীর সহিত তাহার আবাল্যের পরিচয় থাকিলেও কাহারও মধ্যে এমন উদারতা, স্বচ্ছ হৃদয়ের সুকোমলতা ছিল বলিয়া তাহার মনে হইল না!

প্রথম হইতেই সত্যবতীর সঙ্গে গৃহকর্ম্ম করিয়া, তাঁহার সঙ্গে

সঙ্গে ফিরিয়া সে ধীরে ধীরে একটি শান্ত নীড় রচনা করিয়া ফেলিতেছিল। কোনদিন কোন কারণে এই স্ব-রচিত নীড়টি ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে এ ধারণাও যেন তাহার ছিল না।

তরুণ আসে, হাসে, গল্প করে মার সম্মুখেই দু একটা রহস্য করে—ইহার মধ্যেও সে-যেন নিশাগমে নীড়োপবিষ্ট পাখীটির মত নীরব শান্তির আস্বাদ উপভোগ করিয়া থাকে।

সে দিনও, এইমাত্র তরুণ বাহির হইয়া গেল, সত্যবতী তাহাকে খাওয়াইয়া উপরে পাঠাইয়া দিলেন। বলিলেন—যাও মা, একটু শুয়ে পড়গে, আমি আসছি এখনি।

অম্বা উপরে আসিয়া একখানি মাদুর বিছাইয়া তদুপরি সত্যবতীর নিত্যপাঠ্য কবিকঙ্কণ চণ্ডীখানি, পশমের ঝালর দেওয়া পাখাখানি, তাঁহার ক্ষুদ্র বালিশটি গুছাইয়া রাখিয়া আলমারীর মাথা হইতে একখানি বাংলা মাসিক পত্র হাতে করিয়া পথের ধারের জানেলাটিতে চুপ করিয়া বসিল। মাসিক পত্রের ছবিগুলি দেখিয়া কোন একটা কিছু পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল—কিন্তু কোন লেখাতেই সে মন নিবিষ্ট করিতে পারিল না।

এই ক্ষুদ্র গৃহ, যাহার সহিত জীবনে কোনদিনই সে পরিচিত ছিল না, দর্শনযোগ্য কোন আসবাবই সেখানে নাই, তথাপি বার বার সে দেওয়ালে টাঙ্গানো দু তিনখানি মলিন ছবি, ধূম্রবর্ণ গৃহপ্রাচীরই তাহার চোখ দুটিতে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিতেছিল। অম্বার মনে হইতেছিল এখানে আসার পূর্ব্বে

যেন তাহার জীবন ছিল না, এখানে আসিয়াই সে জীবনের সন্ধান পাইয়াছে। একদিন বিরুদ্ধ চিন্তায় জর্জ্জরিত হইয়া এ গৃহখানিকে যে-সে অত্যন্ত ভয়ের স্থান মনে করিয়াছিল. তাহা মনে পড়িতেই তাহার যেন হাসি পাইতে লাগিল।

হায় রে নারীর মন! এ কি তোর ভ্রম! আজ এই পরিপূর্ণ সুখের সন্ধান মিলিতেই পূর্ব্বের দিনগুলিকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া বসিল! অতীতের কোন এক মুহূর্ত্তেই যে এই সুখের আভাষ তাহার হৃদয় পাইয়াছিল, তাহাও একবার ভাবিল না! কেবলই মনে হইতে লাগিল—এই খানেই তাহার জীবন আরম্ভ হইয়াছে এবং তাহার অবসানও এইখানেই হইবে।

এই চিন্তায় সে এতই তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল যে সত্যবতীর নিঃশব্দ আগমন জানিতেই পারে নাই। মধ্যাহ্নের লোকবিরল গলিটির পানে চাহিয়া জীবনেতিহাসের যে কয়টি পৃষ্ঠা উল্টাইতেছিল, সত্যবতী তাহাই অনুমান করিয়া বলিলেন—কি ভাবছ মা অম্বা? পুরাণো কথা!

অম্বা ফিরিয়া চাহিতেই এক ফোঁটা জল টপ্ করিয়া মেঝেতে ঝরিয়া পড়িল। সত্যবতী নিকটে আসিয়া সস্নেহে তাহার বাহু ধরিয়া মাদুরে বসাইয়া নিজ বসনাঞ্চলে চক্ষু দুটি মুছাইয়া বলিলেন—ছিঃ মা, কাঁদে কি?

দমকা বাতাসে মেঘখণ্ডের ভিতর হইতে বৃষ্টিধারার মত সত্যবতীর স্নেহ মধুর কণ্ঠস্বরে অম্বার চোখ ফাটিয়া গেল। নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দানের মত সত্যবতী তাহার মুখখানি নিজের

বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া আস্তে আস্তে বলিলেন—কেঁদো না মা। কালই যাতে তরুণ তোমাকে রেখে আসে, সে ব্যবস্থা করব।

অম্বা আরক্তনেত্রে চাহিয়া কি বলিতে গেল, পারিল না, মুখখানি ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। সত্যবতী সস্নেহে তাহার কেশরাশির মধ্যে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

প্রায় পাঁচ সাত মিনিট কাটিয়া গেলে পর, সত্যবতী মৃদুমধুর স্বরে বলিলেন—আজ সেখানে ফিরে যাবার জন্য এত কাঁদছ, কাল যখন আবার সেখানে যাবে আমাদের জন্যও তোমার এমনি কান্না পাবে। এই যে একদিনে তুমি আমাকেও একেবারে ভুলিয়ে রেখেছ আমারও কি দুঃখ কম হ'বে মা? তা'ত নয়। এই দুপুরবেলা যখন কোন কাজকর্ম্মই থাকবে না আমার হাতে, তখন এই দু'দিনের দেখা তোমারই কথা মনে পড়বে অম্বা। তোমার কান্না মনে করে' আমি ত চোখের জল রাখতে পারব না মা।—বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু দুটিও সজল হইয়া উঠিল।

অম্বা তাঁহার আর্দ্রকণ্ঠস্বরে মুখ তুলিল; কহিল—তবে আমাকে পাঠাবেন না মা!—সে আবার মুখ ঢাকিল।

সত্যবতী চমকিয়া উঠিলেন। তিনি তাহার রুক্ষ কেশরাশির পানে চাহিয়া ভাবিলেন, তবে কি তিনি ভুল বুঝিয়াছিলেন। অম্বার নিদারুণ প্রচণ্ড শোকাবেগ কি অল্পদিনের পরিচয়ে এই দিকেই গোপনে প্রসারতা পাইয়াছে!

একটু ক্ষুণ্ণস্বরে বলিলেন—বাড়ী যেতে চাওনা তুমি?

কোথায় যাব? কে আছে আমার?—বলিয়া সে আবার ফোঁপাইতে লাগিল।

সত্যবতী বলিলেন—কেন তোমার বাবা আছেন ত...

বাধা দিয়া অম্বা বলিল—উনি কি বলেন নি···সে চুপ করিল।

'সত্যবতী অধিকতর বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—কৈ কিছুই ত জানি নে আমি।

অম্বা অল্পে অল্পে বলিল—উনি গেছলেন আসিবার দিন, বাবা নেই।

সত্যবতী কি ভাবিয়া আবার বলিলেন—নেই? কোথায় গেছেন কিছু জানতে পেরেছ?

অম্বা বলিল—কোনদিনই থাকার মত ছিলেন না তিনি। এখন বাউল হয়ে কোথায় চলে গেছেন।

সত্যবতী চুপ করিয়া রহিলেন। তরুণ কেন-যে একথা তাঁহাকে বলে নাই, এ গোপনতার কারণ কি না বুঝিলেও তাঁহার উচ্চহৃদয় অসন্তুষ্ট হইল না; বরঞ্চ একটু প্রসন্নই হইল। সে-যে অম্বার পিতার আশ্রয়ে ফিরাইয়া দিতে গিয়াছিল, সে আশ্রয় শূন্য দেখিয়াই এই ভার বহন করিয়া আনিয়াছে ইহাও তাঁহার মনে হইল।

কিন্তু কথা ত সেইখানেই শেষ নয়। এ-যে একেবারে তাঁহাকে লক্ষ্যহীন দিশাহারার মত বিহ্বল করিয়া দিল। বলিলেন—তোমার অন্য কোন আত্মীয়...

বাধা দিয়া অম্বা বলিল—আর কেউ নেই।

সত্যবতী নির্ব্বাক্। অল্পক্ষণ পরে বলিলেন—তাইত অম্বা, যে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।—একটু থামিয়া আবার বলিলেন—তরুণ কিছু বলেছিল?

অম্বা প্রশ্ন সম্যক বুঝিতে না পারিলেও তরুণের যে অভয়বাণী দেবারাত্র তাহার হৃদয়-মধ্যে ধক্ ধক্ করিতেছিল, সেই-টিই বলিয়া ফেলিল।

বলেছিলেন, আমি ভেবে কিছু ঠিক করতে পারছি-নে, আমার মার কাছে চল—সেখানে গেলেই আমরা নিশ্চিন্ত হ'তে পারব।

সত্যবতী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। অম্বার মনে হইতেছিল, ঝড় উঠিয়াছে—এইমাত্র যে আশ্রয়টিকে সে সবলে চাপিয়া ধরিতেছিল, বাতাসের ভর সহিতে না পারিয়া বুঝি-বা সেই ক্ষুদ্র নীড়টি তাহার শাখাচ্যুত হইয়া পড়ে। সে দু'টি হাতে সত্যবতীর চরণ ধরিয়া বলিল—আমাকে ফেলে দেবেন না-মা।

সত্যবতী সে-কথার উত্তর না দিয়াই ডাকিলেন—অম্বা!

অম্বা মুখ তুলিতে পারিল না। তাহার নীচের আসন যেন প্রতি-মুহূর্ত্তেই উত্তপ্ত হইয়া তাহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছিল।

সত্যবতী বিমর্ষ-মুখে বলিলেন—তোমার মুখে সব-কথা না শুনে ত আমি উত্তর দিতে পারি না, অম্বা!

এবার অম্বা চাহিল, কিন্তু গলা দিয়া একটি শব্দও বাহিরে আসিল না।

সত্যবতী বলিলেন—তুমি বলেছিলে, তোমার বিবাহ-সম্বন্ধ

হ'য়েছিল, তাঁরই সঙ্গে তুমি কাশী যাচ্ছিলে, পথে বিপদ ঘটায়, তরুণ তোমাকে......

অম্বা বলিল—বিপদের কথা আমরা তখন জান্তাম না।

সত্যবতী বলিলেম—তবে কি-করে আমার ছেলের সঙ্গে তোমার দেখা হোল?

অম্বা মোগল-সরাই ষ্টেশন পর্য্যন্ত যাহা ঘটিয়াছিল বিবৃত করিল।

সত্যবতী বলিলেন—তাহ'লে বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছিল কেন বল্‌ছ? খোট্টাটা তোমাকে বিয়ে করবে বলে নিয়ে পালাচ্ছিল বল?

অম্বা কথা কহিল না।

কি বলেছিল সে তোমাকে—বিয়ে করবে—এই না? তাই যদি, তোমার বয়স ত কম হয়-নি—এই এক কথাতেই চেনা নেই শুনো নেই, তুমি একেবারে বেরিয়ে পড়লে?

অম্বার দৃষ্টি-সম্মুখে মাটি যেন কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

সত্যবতী বলিলেন—বাঙ্গালীর মেয়ে—এ-যে পারে তার অসাধ্য কি রইল আর! তোমার বাবা বুঝি সংসারের খবরই রাখ্‌তেন না?

অম্বা অস্ফুট স্বরে বলিল—তাঁর দোষ নেই। সেদিন তিনি বাড়ী ছিলেন না।

সত্যবতী ঘৃণায়-লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া লইলেন, একমিনিট পরে বলিলেন—আগে থাকৃতেই পরামর্শ হ'য়েছিল বুঝি যে, যেদিন তিনি থাকৃবেন না, সেইদিন দু'জনে......

অম্বা শক্ত হইয়া বসিল, তাহার মনে হইতেছিল—সে পড়িয়া

যায়! পরামর্শ যে আদৌ হয় নাই তাহা নহে, তবে পলায়নের পরামর্শ হয় নাই। ব্রিজমল আশা দিয়াছিল, বিবাহ করিয়া 'জোড়ে' ফিরিয়া আসিয়া ক্ষমা চাহিলেই পিতা ক্ষমা করিবেন। আজকাল নিত্যই এরূপ হইতেছে, ইহা দোষের কথা নহে এবং কলিকাতায় খবরের কাগজে সহস্র সহস্র ঘটনা সে পড়িয়াছে—অম্বাকে তাহাই বুঝাইয়াছিল। কলিকাতা-প্রত্যাগত দু-দশজনের কাছে হিন্দুস্থানী-বাঙ্গালীর, ইংরেজ-বাঙ্গালীর, মুসলমান-হিন্দুর বিবাহোপাখ্যান সে শুনিয়াছিল। ধর্ম্মসঙ্গত বিবাহ সমস্ত জাতির মধ্যেই হইতে পারে, ব্রিজমলবাবু এ-কথা তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু এ কথা ত সে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিবে না।

সত্যবতী বলিতে লাগিলেন—হিঁদুর মেয়ের এ কতবড় অপরাধ তা-কি জান তুমি? তোমাকে স্বচ্ছন্দমনে ঘরে নিতে পারবে, এমন লোক ত ভূভারতে আছে বলে আমার মনে হয় না। তোমার বাবা থাকলেও—তিনি নিতেন না।

অম্বা বিবর্ণমুখে বসিয়া রহিল। সতবতীর কথাগুলি যেন আগুনে পুড়িয়া তাহার বুকের মধ্যে ঢুকিয়া অন্তঃস্থল অবধি দগ্ধ করিয়া দিতেছিল। এই আগুনে পোড়া ছাড়া কোন অনুভূতিই সে-সময়ে তাহার ছিল না।

সত্যবতী বলিলেন—তোমার বাবা বিয়ের চেষ্টা করতেন না?

অম্বা কথা কহিল না।

সত্যবতী একটু পরে বলিলেন—তরুণ জানে সব?

জানেন—বলিয়াই অম্বা মুখ ফিরাইয়া লইল।

সত্যবতী আর কিছু বলিলেন না। দুই-তিন মিনিট পরে অম্বা কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। সত্যবতী একটি কথাও বলিতে পারিলেন না। মনের মধ্যে চিন্তার সমুদ্র যেন উত্তাল-তরঙ্গ তুলিয়া লাফালাফি করিতেছিল।

পুত্রের নিষ্ঠা, একাগ্রতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা চিরদিনই তাঁহার গর্ব্বের বস্তু ছিল—অম্বার আকস্মিক অভ্যুদয়ে তাহার মনুষ্যত্বই প্রকাশ পাইয়াছিল, সত্যবতী একথাটিও যেমন নীরবে স্বীকার করিয়া লইলেন, এই ষোড়শী তরুণী পতিতার সততায় সত্যবতীর সতী-হৃদয় বেশীক্ষণ ক্ষুব্ধ রহিল না। সে-যে মিথ্যা করিয়াও একটা মিথ্যা বলে নাই এবং কঠোর সত্যগুলি নির্ভয়-চিত্তে ব্যক্ত করিতে পারিয়াছে,—পৃথিবীর অন্য লোকে কি করিত, কি বলিত না বলিত জানি না—সত্যবতীর হৃদয় অম্বাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া লইতে কার্পণ্য করে নাই ভাবিয়া—সত্যবতী ক্ষুব্ধ হইলেন না।

সতেরো

অম্বার মনে হইতেছিল—আর বুঝি সে কাহাকেও এই কালীমাখা মুখখানা দেখাইতে পারিবে না। সত্যবতীর কক্ষ হইতে বাহির হইয়া পাশের ক্ষুদ্র কক্ষে টেবিলে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল। এই কতক্ষণ পূর্ব্বে এই ভগ্নপ্রায় গৃহখানি তাহার চক্ষে কাম্য, প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল এখনই আবার সে গৃহপ্রবাহিত

বিষাক্ত বাতাস হইতে মুক্তিলাভের জন্য সে একেবারে উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িল।

সত্যবতী নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়া শিকল বন্ধ করিলেন। ধীর-পদক্ষেপে নীচে নামিয়া গেলেন। অম্বা উৎকর্ণ হইয়া সমস্তই শুনিতেছিল। কতবার তাহার ইচ্ছা হইল, সত্যবতীর সঙ্গেই নীচে নামিয়া পড়ে, অন্যদিনের মত জল-খাবার তৈরী করিতে তাঁহাকে সাহায্য করে—কিন্তু তাহার অবোধ দেহমন তাহারই বিপক্ষে বিদ্রোহ করিয়া উঠিল।

আজ সে নিজের মনেই অনুভব করিতে লাগিল, সত্যবতী আর তাহাকে সংসারে কোন কাজেই হাত দিতে দিবেন না ; কঠিন কথা না বলিলেও এই-যে কাজে-কর্ম্মে তাহাকে অব্যাহতি দিবেন—সে তাহা সহ্য করিবে কি-করিয়া ? অথচ—সহ্য করিতে হইবে, এমনই একটা অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ক্রমাগত তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল।

পুরুষের হৃদয় মন যে এই সংঘাতে কত অসঙ্কুচিত উদার, সেদিনকার তরুণের কথাতেই সে তাহাও ধারণা করিয়া লইয়াছিল। তাহার নিদারুণ লজ্জার দুঃখের যে মহাপরাধের জন্য নারীর নিকটে সে কত-না লাঞ্ছনার শঙ্কা করিয়া মরিতেছে, পুরুষ কত সহজে তাহাকে মার্জ্জনা করিয়াছিল—মনে পড়িতেই হৃদয় একেবারে উৎসব-মুখর হইয়া উঠিল।

একবার না, বারবার তরুণ তাহাকে এই মাতৃগর্ব্বের পরিচয় দিয়াছিল বলিয়াই অম্বা সকল সঙ্কোচ লজ্জা সবলে ঝাড়িয়া ফেলিয়া ধীরপদে নীচে নামিয়া পড়িল।

সত্যবতী ভাঁড়ার ঘরটিতে বসিয়া ময়দা মাখিতেছিলেন, টিনের একটা উনানে আধ-ধরা কয়লা হইতে ধোঁয়া উঠিয়া ঘরখানাকে অন্ধকার করিয়া ফেলিয়াছে, অম্বা একেবারে সত্যবতীর পাশের কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল—আমি মেখে দিচ্ছি মা!

সত্যবতী গম্ভীর স্বরে বলিলেন—আর হ'য়ে গেছে।

অম্বা শুনিয়াও শুনিল না, বলিল—বেলে দিই।

সত্যবতী কথা কহিলেন না; একবার অম্বার মুখের পানে চাহিয়া, যেমন ময়দা মাখিতেছিলেন, তেমনি মাখিতে লাগিলেন।

অম্বা ছলছল মুখে বলিল—আমি দিতে পাব না?

পাবে না কেন? তুমি ত দিয়েছ—বলিয়া সত্যবতী দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

অম্বা কোনদিকে না চাহিয়া পাথরখানা টানিয়া লইতে গিয়াও পারিল না। তাহার ভয় হইতেছিল, পাছে চোখো-চোখী হইলে সত্যবতী নিষেধ করিয়া বসেন।

সত্যবতী পাখা লইয়া উনানে বাতাস দিতে লাগিলেন। এমন সময় তরুণ রৌদ্রে ঘামিয়া, লাল হইয়া বাড়ী ঢুকিল। ভাঁড়ার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বলিল—এই-যে জুটিতে লেগে গেছ কাজে!

সত্যবতী অম্বার নতমুখের পনে চাহিয়া, পরমুহূর্ত্তে ফিরিয়া বলিলেন, তুই-যে এত সকাল-সকাল?

তরুণ বলিল—কেন? কালই ত তোমায় বলেছিলুম, সুপ্রিয়া

তার মা'র সঙ্গে দার্জ্জিলিঙ চল্ল—আমি দেখা করে চলে এলুম, আজ সে ত পড়লে না।

যা—জামা ছেড়ে ফেলগে—নেয়ে এসোছস্।

তরুণ চলিয়া গেল। সত্যবতী বলিলেন, লুচি বেল অম্বা।

অম্বা একেবারেই পাথর টানিয়া লইতে পারিল না।

সত্যবতী উনানের উপর কড়াটি চড়াইয়া দিয়া বলিলেন, কৈ, অম্বা?

অম্বা লুচি বেলিতে লাগিল। সত্যবতী নিঃশব্দে উনানের সম্মুখে বসিয়া রহিলেন।

তরুণ উপর হইতেই বলিল, হ'য়েছে না-কি মা?

হয়েছে আয়—বলিয়া সত্যবতী অম্বার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, দাও-ত মা, একখানা আসন পেতে……

তরুণ আসিতেই অম্বা চাকী-বেলনা তুলিয়া কক্ষের বাহির হইয়া গেল। যদিও থাকিবার ইচ্ছাই তাহার ছিল, কিন্তু বিরুদ্ধ-স্বভাবের মাতা-পুত্রের সম্মুখে নিজের অস্তিত্বটাকে খাড়া করিয়া রাখিতে পারিল না। বাহিরের দরজার পাশে কলতলায় একটা টুল পড়িয়া থাকিত—তাহাতে বসিয়া পড়িল।

খোঁচা খাইয়া অম্বার মন কেমন সতর্ক হইয়া উঠিয়াছিল, আড়ালে থাকিয়া কাহারও কথাবার্ত্তা শোনা যে কত বড় পাপ—তাহা সে জানে কিন্তু আজ যে মাতা ও পুত্রমধ্যে তাহারই ঘৃণিত জীবনের আলোচনা চলিবে—এ কেমন সে নিজেই ঠিক করিয়া লইয়াছিল; তাই আর কিছুতেই সেখান হইতে উঠিতে পারিল না।

[library stamp]

সত্যবতী ঘটি হাতে করিয়া বাহিরে হাত ধুইতে আসিয়াছিলেন, অম্বাকে দেখিয়া দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। কিন্তু তরুণ যে-মাতৃগর্ব্বে স্ফীতবক্ষ হইত, তাহা ত মিথ্যা নহে, সত্যবতী নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন। ভোজন-রত যুবক কিছুই জানিল না যে এইমাত্র যে-দুয়ের মঙ্গল-সম্মিলনে সে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল—একমিনিটের মধ্যেই দুজনে কেমন বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

সত্যবতীর মনে হইতেছিল—অম্বা রোজই এইরকম সরিয়া যায় বটে—অন্যদিন তিনি তাহা লজ্জা বলিয়া মনে করিতেন, গোপনে সব কথা শুনিবার যে এই অছিলা, তাহা আজ বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার এক একবার ইচ্ছা হইতেছিল—তাহারই সম্বন্ধে গোটাকতক কঠিন কথা তিনি তরুণকে বলিয়া দেন—অম্বা নিজের কানেই তাহা শুনিয়া লউক—কিন্তু তরুণের মনুষ্যত্বের, তাহার দয়ালুতার গর্ব্ব ত গল্পের বিষয়ীভূত নহে—অম্বা যে বিপদে তরুণের মত হৃদয়বান্ পুরুষের সাহায্য পাইয়াছিল, যত বড় কলঙ্কের ছাপই তাহার গায়ে মারা থাক্—তিনি ত তরুণকে অপরাধী করিতে পারিবেন না।

তরুণ খাইতে খাইতে কি-দুএকটা কথা বলিতেছিল, সত্যবতীর তাহাতে মন ছিল না। হঠাৎ তরুণ বলিয়া বসিল, অম্বা কোথায় গেল মা?—সত্যবতী বলিলেন, বাইরে বসে আছে।

বাহিরে কেন? ডাক-না।

সত্যবতী উঁকি দিয়া দেখিলেন—টুলের উপর মানুষ নাই।

সে-যে তাঁহার চোখে পড়িতেই সরিয়া গেছে—ইহা বুঝিয়াই সত্যবতীর মন আরও বিমুখ হইয়া গেল। বলিলেন, এখানে নেই।......আরও কি বলিবার ছিল, বলিতে পারিলেন না। তরুণ যে সব জানিয়া শুনিয়াও এই গ্রহ জুটাইয়া আনিয়াছে—মনের মধ্যে যথেষ্ট উদারতা থাকিলেও—সত্যবতীর মন তরুণের প্রতি অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।

হয়ত জগৎ-সংসারে এমন একটা অবিবেচনা অনেক জননীর পক্ষে একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠিত কিন্তু তিনি নীরবেই মানিয়া লইতেছিলেন। জীবনে এমন একদিনও আসে নাই যখন তরুণের কোন কাজে তাঁহার ক্ষোভ বা দুঃখ জন্মিয়াছে। এই-যে ঘটনাটি ঘটিয়াছে—যত বড় অবিবেচনা, অপরিণামদর্শিতার কাজই হোক—ইহা-যে তাহার অনিচ্ছাকৃত অপরাধ, ক্ষুব্ধ হইলেও প্রকাশ করিবার শক্তি সত্যবতীর মুখে ছিল না। পুত্র-স্নেহাতুর হৃদয়খানিতে যে ঝড় উঠিয়াছিল—তাহা ত নির্ব্বাণ হইল না—গোপনতায় আরও বাড়িয়া চলিতে গেল।

তরুণ সে-সবের কোন খবর রাখিল না, আহার করিয়া উপরে উঠিতেই দেখিল, অম্বা দুই জানুর মধ্যে মুখ রাখিয়া বসিয়া আছে। সে ডাকিল—অম্বা!

অম্বা মুখ তুলিতেই তাহার আরক্ত মুখ-চোখের ভাব দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত হইয়া গেল। এই যে কতক্ষণ আগে অম্বাকে মার কাছে বসিয়া লুচি বেলিতে দেখিয়া আসিয়াছে—ধূমমলিন গৃহে তাহার মুখটি স্পষ্ট দেখিতে না পাইলেও, সে-যে নিশ্চিন্তমনে বলিয়া

আসিয়াছিল—এই-যে ছুটিতে লেগে গেছ কাজে! কতদিনের উদ্বিগ্নতা, উৎকণ্ঠা যে তাহার মুখের ঐ কথাগুলিতে ঝরিয়া গিয়াছিল—তাহা ত প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছিল; তাই অম্বাকে এই রকম দেখিয়া সে একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িল।

আঠারো

অম্বাকে সে আর-একটা প্রশ্ন করিতে পারিল না। তাহার মা যে অসহায়া দুঃখপ্রপীড়িতা অম্বাকে ব্যথা দিতে পারিবেন—ইহাও তাহার বিশ্বাস হইতেছিল না। অথচ এক মুহূর্তের একটি দৃষ্টিপাতেই সে বুঝিল—এমন একটা কিছু হইয়াছে, যাহার ভারেই অম্বা কাতর হইয়া পড়িয়াছে।

নিজের ঘরের বহি-পত্রের কাছে দাঁড়াইয়া দুই মিনিট ধরিয়া তরুণ এই কথাই ভাবিয়া লইল। জানেলার ফাঁক দিয়া অম্বাকে দেখা যাইতেছিল, তাহাকে আর প্রশ্ন করিতেও তাহার সাহস হইতেছিল না। মা'র কাছে যাওয়াও যে কত দুঃসাধ্য তাহা অনুভব করিয়াই সে মুহ্যমানভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পর্যান্ত সত্যবতী উপরে আসিলেন না, অম্বাও তেমনই বসিয়া রহিল—ঘরের মধ্যে থাকিয়া তরুণের মস্তিষ্ক উষ্ণ হইয়া উঠিল। গোপন-পীড়ার ভার সে আর সহ্য করিতে পারিল না। মৃদুকণ্ঠে ডাকিল—অম্বা!

অম্বা উত্তর দিল না।

তরুণ নিকটে আসিয়া ডাকিল—অম্বা !

অম্বা মুখ তুলিয়াই ঝড়ের মত নীচে নামিয়া গেল। তরুণ এক মিনিট হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া আবার ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। টেবিলের উপর রাশি রাশি বই-খাতা ছড়ানো—তারই একখানা টানিয়া লইয়া সে চেয়ারে বসিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু দিনের আলো ম্লান হইবার আগেই ছাপার অক্ষর চোখের সামনে একেবারে একাকার হইয়া গেল।

বিকালেও তাহার টিউশনী ছিল, কিন্তু আজ যে-সে কোন প্রয়োজনেই বাহির হইতে পারে—মনের এ অবস্থা তাহার ছিল না। অথচ বন্ধ ঘরের বাতাসের চাপ ক্রমেই তাহার পক্ষে দুর্বহ হইয়া উঠিতেছিল—চিরদিন সে খোলাখুলি ভাবেই মা'র সঙ্গে সমস্ত আলোচনা করিয়াছে—আজ সে উৎসাহ যে কোথায় অন্তর্হিত হইল, সে-যেন তাহার কোন সন্ধানই পাইল না। আলো-আঁধারের এমনি একটা লীলা চলিতেছিল যে তন্মধ্যে ডুবিবার মত প্রবৃত্তিও তাহার হইল না।

সে নীচে নামিয়া দেখিল—অম্বা সেই টুলখানিতে নীরবে বসিয়া আছে। পিছন হইতে আর কিছুই সে দেখিতে পাইল না—কিন্তু তাহার মনে হইল সে-যেন সবলে কান্না রোধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। দুরন্ত শোকোচ্ছ্বাস ভিতর হইতে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল।

নারীচরিত্রে তাহার অভিজ্ঞতা যে অত্যন্ত অল্প তাহা পূর্ব্বেও দেখা গিয়াছে। সে বারান্দায় অম্বাকে ডাকিয়া সাড়া পায় নাই,

সহানুভূতিপূর্ণ তরুণের হৃদয় তাহাতে ক্ষুণ্ণই হইয়াছিল। কিন্তু নীচে নামিয়া যাইতেই সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ভাবিল, অম্বা যে তাহার আহ্বানে সাড়া দেয় নাই, ব্যথা পাইয়াও আর তাহার কাছে বেদনাক্ষুণ্ণ মুখ লইয়া আসিয়া দাঁড়ায় নাই—ইহাতে সে একটা তৃপ্তি অনুভব করিল।

একটা যে গোল হইয়াছে এবং তাহার মীমাংসা করিয়া দেওয়াও আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল বুঝিলেও নিজের অক্ষমতার কথা মনে করিয়া সে অগ্রসর হইতে পারিল না। সে-ও যে মা'র কাছে প্রকাশ করিতে অপটু—ইহা ত এক্ষণেই সে বুঝিয়াছে।

তখন তরুণ কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। কি বলিবে, কোন কথায় অম্বার ব্যথা সারিয়া যায়—তরুণের তাহা অজ্ঞাত ছিল। তাহাকে পাশে দেখিয়াই অম্বা যে কাঁদিয়া উঠিবে—ইহাও সে জানিত না।

অম্বা চক্ষে বস্ত্র দিয়া উঠিয়া গেল। কোথায় গেল, কেন গেল—এ সবের কোনটিই তাহার মনে হইল না। সে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, মা একখানি কম্বলের উপর উপুড় হইয়া শুইয়া আছেন। তাহার পদশব্দে চক্ষু মেলিতেই তরুণের হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল—আজ যেন সকলের চক্ষুতেই বর্ষার মেঘ নামিয়া আসিয়াছে।

অম্বার শোকব্যথা তাহার মনে লাগিয়াছিল বলিয়াই সে দপ্ করিয়া ঘরে ঢুকিয়াও একটা কথা উচ্চারণ করিতে পারিল না।

বরং মনে করিল, এখান হইতে বাহির হইতে পারিলেই সবচেয়ে সুখের হইত, কিন্তু সত্যবতীর ব্যবহারটি তাহাকে সচেতন করিয়া ফেলিয়াছিল বলিয়া সে চেষ্টা করাও তাহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল।

গোপনতার ব্যথা বহিতে পারিবে না বলিয়াই সে সত্যবতীর মাথার কাছে বসিয়া পড়িল। স্বেচ্ছাগত সন্তানকে সম্ভাষণ করিতে না পারিয়া সত্যবতীর মাতৃহৃদয় আর বশ মানিতে চাহিল না।

তরুণ এই প্রচ্ছন্নতার মধ্যে যেন হাঁফাইয়া উঠিতে লাগিল। অম্বার দুঃখের কারণ যদি বা এতক্ষণ অস্পষ্ট আকারেই ছিল, এখন নিশান্তে অরুণোদয়ের মতই পরিষ্কার হইয়া গেল। এই আলোকের নীচে যে কতখানি অন্ধকার ঘনীভূত ব্যথায় জমিয়া উঠিয়াছিল—তাহাও সে বুঝিতে পারিল। তবে কি সত্যবতী চিরদিন তাহার সম্মুখে পুঁথির মত শুধু আদর্শই স্থাপিত করিয়াছিলেন! চিরকাল তাঁহার সুকোমল হৃদয়ালুতার পরিচয় পাইয়া সে কত না উৎফুল্ল হইয়া উঠিত—আজ সে সাশ্চর্যে ভাবিতে লাগিল—সত্যবতীর হৃদয়ের কি কোন যোগই ছিল না? সে-কি কেবল আদর্শ সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছুই নয়?

তরুণ ভাবিল, ইহা ত কোনদিনই সে টের পায় নাই। কথায়, ভাবে চিরজীবন সত্যবতীর হৃদয়ের এমন পরিচয় সে পাইয়া আসিয়াছে—যাহাকে সে সমুদ্রের মত অতল ও স্বচ্ছ বলিয়াই জানে। অনুকূল-প্রতিকূল কোন বাধা বিপত্তিতেই সে হৃদয় কখনই দুলিয়া উঠে নাই, আজ এ-কি হইল? তরুণ-

ভাবিতে লাগিল—সে কি তাঁহাকে এতই ভুল বুঝিয়াছিল? সেই ভুলবিশ্বাসে কেবল অন্ধের মত পূজা দিয়াই আসিয়াছে! যদি তাঁহার হৃদয়ের এইদিকটা এত অন্ধকার, তবে সে কি করিবে, কোথায় দাঁড়াইবে!

পাঁচমিনিট পরে রুদ্ধশ্বাসে বলিল—মা, অম্বা কাঁদছে।

সত্যবতী সংক্ষেপে বলিলেন—কাঁদছে কেন?

তরুণ অধিকতর বিস্মিত হইল। এইটিই হওয়া সম্ভব—কল্পনা করিয়া সে মা'র কাছে আসিয়া বসিয়াছিল, এখন তাঁহার প্রশ্নে দিক্‌ভ্রান্ত নাবিকের মত এদিক ওদিক করিতে লাগিল।

সত্যবতী কি-একটা কথা বলিবার অনেক চেষ্টাই করিলেন—কথা বাহির হইল না, আড়ষ্টভাবে পড়িয়া রহিলেন।

তরুণ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিল—তুমি জাননা মা?

সত্যবতী একটি 'না' বলিয়া চুপ করিলেন।

সত্যই তিনি জানিতেন না। কত কষ্টে তিনি বিরোধ দমন করিয়াছিলেন, নিরাশ্রয়, অসহায়া ভাবিয়া তাহাকে যে একটি কথাও বলেন নাই—তাহা ত তিনি জানেন। এই রকমের কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিলেন, তরুণ তৎপূর্ব্বেই বাহির হইয়া গেল।

একবার দীপ্তনেত্রে বাহিরের দিকে চাহিয়া সত্যবতী আবার বালিশে মুখ গুঁজিয়া ফেলিলেন।

উনিশ

তরুণ যে এত শীঘ্র আবার তাহাকেই ধরিতে আসিবে, অম্বা তাহা জানিত না। তরুণের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর একেবারে তাহার অন্তঃস্থল বিদ্ধ করিয়া ফেলিল।

ঘরে ঢুকিয়াই তরুণ বলিল,—কাঁদছ কেন অম্বা!

হায়! এ-কি প্রশ্ন! কান্নার রাশিকৃত কারণের যে তাহার অসদ্ভাব নাই জানিয়াও তরুণ এমনি কঠোর অর্থশূন্য প্রশ্ন করিয়া বসিবে—এও তাহার কল্পনার অতীত ছিল। সে তাহার কি উত্তর দিবে?

বুঝি প্রশ্নটা তরুণের নিজের কাণেই বেসুরো বাজিয়াছিল, একটু পরে বিচলিতস্বরে বলিল—তোমার যদি কোন দুঃখ থাকে, আমাকে কেন বল্‌বে না অম্বা?

এ-ও সেইরকমই প্রশ্ন! কেন বলিবে না—তারও কি উত্তর আছে! তরুণ যদি বলিত—বল, অম্বা!—গোপন করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না, বলিতেই হইত।

উত্তর না পাইয়া তরুণ নিকটে সরিয়া আসিল, বলিল—অম্বা! কি চাও তুমি?

হায় রে পুরুষ জাত! মনুষ্যত্ব মনুষ্যত্ব করিয়া এত হাঁকা-হাঁকি—এই সব তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ প্রয়োগেও ত দ্বিধা জন্মে না!

বারবার তিনবার—কোন সাড়া না পাইয়া তরুণ ধরাগলায় বলিল—অম্বা, তোমার কাছে আমি অপরাধ করেছি……

অম্বা মুখ তুলিয়া চাহিতেই তরুণ বলিয়া উঠিল—আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত যে তোমাকে এমন করে করতে হ'বে তা আমি জান্তাম না।

আর চোখ তুলিবার ধৃষ্টতা হইল না। যে-ভয়ে সে চোখ তুলিতে পারিল না সেই অব্যক্ত ব্যথাতেই তাহার চক্ষু হইতে টপ্ টপ্ করিয়া জল ঝরিতে লাগিল।

তরুণ খপ্ করিয়া তাহার বাহুটা ধরিয়া টান দিয়া বলিল—কি হয়েছে বল? এখানে থাক্‌তে চাও না?

অম্বা হাতটি ছাড়াইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না।

তরুণ আরো জোরে টানিয়া নিকটে আনিল, বলিল—কেন বলছ না অম্বা!

কি বলব?—বলিয়া সে দুই করপুটে মুখ ঢাকিল। তরুণ তাহার বাহু ছাড়িয়া দিতেই অম্বা দুই পা পিছাইয়া গিয়া বলিল—আমাকে তুমি কোথাও পাঠিয়ে দাও। তোমার পায়ে পড়ি।—বলিয়া সে বসিয়া পড়িয়া তরুণের পায়ের উপর হাত রাখিল।

তরুণ একমিনিটকাল কথা কহিতে পারিল না, অবশেষে কম্পিতস্বরে ধীরে ধীরে বলিল—কেন যেতে চাও, অম্বা! আর যাবার কোথায় বা স্থান আছে?

মুখে আসিয়াছিল—যমালয়ে—কিন্তু বলা হইল না। তরুণ

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—আমার গুরুদেবের আশ্রমে যাবে অম্বা ?

অম্বা বিহ্বলচিত্তে বলিয়া উঠিল—যাব, তরুণবাবু, যাব। যেখানে হোক আমাকে বিদেয় করে দিন।

বিদেয়! বিদেয় কেন অম্বা ?—সে ভগ্নস্বরে এই কথা কয়টি বলিল।

তা ছাড়া আর কি-বলব বলুন। গৃহস্থের ঘরে যে অভিশাপের মত······

সে কথা কে বলেছে তোমায় ?

অম্বা শক্ত হইয়া বলিল—মুখে না-বলুন, কিন্তু সত্যি করে বলুন ত, এটা কি আপনিও ভাবছেন না যে এ গলগ্রহ না জুটলেই ছিল ভাল।

তরুণ একমুহূর্ত্ত পরে উত্তেজিত হইয়া বলিল—না অম্বা। তা আমি ভাবি নি। সত্যি করেই বলছি—তবে......

সে চুপ করিল, কিন্তু অম্বা কথাটার শেষ শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, বলিল—তবে কি ? চুপ করলেন কেন ?

তরুণ বলিল—যদি সত্যই বলতে হয় অম্বা, বলছি, বুঝি আমাদের দেখা হওয়াই কোনদিন উচিত ছিল না।

অম্বা হাঁ করিয়া কথাগুলি গ্রাস করিয়া ফেলিল। মুখখানি অল্প রাঙা হইয়া উঠিল।

তরুণ পুনরায় কহিল—তুমিই সত্য কথা বলতে বলেছ অম্বা, তাই বলছি—যেন অন্য কিছু মনে করে রাগ করে বসো না। যে

কথা আমি তোমাকে বল্‌ছি—কোনদিন না কোনদিন বলতেই হ'ত তোমাকে। না বলে' উপায় ছিল না। অম্বা!

অম্বা সাড়া দিল না, সে-যেন পুলক প্রবাহে স্নান করিয়া উঠিতেছিল; একমুহূর্ত্তে তাহার সর্ব্বাঙ্গ স্বেদসিক্ত হইয়া গেল।

তরুণ কম্পিতকণ্ঠে বলিল—অম্বা তুমি আমার আজীবনের সংকল্প ভাসিয়ে দিয়েছ বলেই এ-কথা তোমাকে বল্‌তে আমি বাধ্য। নইলে কোনদিন কেউ তা শুনতে পেত না, তুমিও না।

অম্বা বিচলিতভাবে বলিল—কি করেছি?

তরুণ কি ভাবিল, পরে বলিল—কি করেছ শুনবে? বল্‌ছি। কাশী গয়া বৃন্দাবন হিন্দুর কাছে এসব মহাতীর্থ নয়? এই সব তীর্থে গিয়ে লোকে কত দানধ্যান করে আসে না? জান ত?

জানি।

আমার তেমনি একটা তীর্থ আছে। সেখানে আমি সব দান করে এসেছি। আমার বল্‌তে যা কিছু—কামনা, বাসনা, ধর্ম্ম, অর্থ সব। যদিও এসবের কোনটিই আমার প্রচুর ছিল না, তবু যা ছিল, যত সামান্যই হোক্—সব আমি সেখানেই দিয়ে এসেছি।

অম্বা নির্ব্বাক-বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

তোমাকে আশ্রমের কথা বলেছি না? সেই আমার তীর্থ!

স্কুল!

তরুণ গম্ভীরভাবে বলিল—তোমার কাছে তাই। যেমন দেখ না, হিন্দু ছাড়া অন্য জাতের কাছে এত বড় তীর্থ কাশীও ত একটা

সহর বৈ আর কিছু নয়। কিন্তু হিন্দুর চক্ষে ‘স্বর্ণ কাশী’ মনে আছে ত! আমারও তেমনি, আশ্রম ত কেবলই স্থূল নয়।

অম্বা বলিল—তবে কি?

তরুণ বলিল—সে তোমাকে বোঝাতে পারব না—ক! তবে এইটুকু জেনে রাখ, তোমাকে যখন সেখানে রেখে আসতে চাই আমি—

বাধা দিয়া অম্বা বলিয়া উঠিল—আপনি যান ত?

যাই বৈ কি—বলিয়াই তরুণ যেন হোঁচট খাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল—সেখানে আমাদের এক সম্বন্ধ ছাড়া আর কোন সম্বন্ধ থাকবে না, অম্বা। সে স্নেহের সম্বন্ধ।

অম্বা আহত হইয়া বলিল—তার মানে?

তরুণ বলিল—মানে! মানে আর কি! সেখানে তুমিও কাজ করবে, আমিও কাজ করব—এই পর্য্যন্ত। সে স্থান গৃহীর নয়, অম্বা, সব ত্যাগ করেই মানুষ সেখানে যায়।

অম্বা ব্যঙ্গের স্বরে বলিল—আপনি সন্ন্যাসী!

একদিন ছিলুম তাই! এখন সে কথা বলতে গেলে প্রবঞ্চনা করা হয়। তা সে যাই হোক, অম্বা তোমাকে আমি ভালবাসি।

হয়ত অম্বা শেষের কথাটা শুনিতে পায় নাই, মাটির দিকে চাহিয়া বলিল—না তরুণবাবু, আমি সন্ন্যাসী সাজতে পারব না।—একটু থামিয়া আবার বলিল—তারচেয়ে আমি দেশেই যেতে চাই।

তরুণ সাশ্চর্য্যে দেখিল যে মুখ এখনই অরুণালোকে পূর্ব্বাকাশের মতই রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা একেবারেই পাংশু

পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছে। অম্বার কথায় সে ব্যথা পাইয়াছিল—তাই তাহার মুখের এই বিবর্ণতা দেখিয়াও দেখিল না, বলিল—একান্তই যাবে তুমি?

অম্বা কথা কহিল না, ঘাড় নাড়িল মাত্র।

তরুণ আর্ত্তকণ্ঠে বলিল—তাই হ'বে অম্বা। বলিয়া সে ধীরপদে নীচে নামিয়া গেল।

সত্যবতী ভাঁড়ার ঘরেই আছেন—ভাবিয়া সে কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সোজাসুজি বাহির হইয়া গেল।

কুড়ি

সত্যবতী সন্ধ্যাদীপটি হাতে লইয়া ঘরে ঢুকিতেই দেখিলেন—অম্বা চুপ করিয়া শুইয়া আছে। তরুণ বাহির হইয়া যাইতেই তাঁহার মনে হইয়াছিল, অম্বাকে কাছে ডাকিয়া ল'ন কিন্তু পারেন নাই। না-পারিবার কারণও ঘটিয়াছিল, তাহা এই—

তরুণ উপরে উঠিবার পর অনেকক্ষণ কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া সত্যবতী ভাঁড়ার ছাড়িয়া উপরে উঠিতেছিলেন, হঠাৎ সিঁড়ি হইতে তরুণের কণ্ঠস্বর শুনিয়া এক মিনিট স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে নিজের ঘরটিতে ঢুকিয়া বসিয়া পড়িলেন। কতবার ইচ্ছা হইয়াছিল যে নামিয়া যাওয়াই তাঁহার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য কিন্তু সংসারে না-কি এই সংশয়ের অবস্থাটিই জননীর অত্যন্ত বিবেচনা সাপেক্ষ তাই নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে বসিয়া থাকিতে হইল।

বসিয়া-বসিয়াও সত্যবতীর মনে হইতেছিল—উহাদের কথোপ-কথনে তিনি কাণ দিবেন না, কিন্তু এক একটা কথা একেবারে শব্দভেদী বাণের মত তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিয়া দিতেছিল। সব শেষ করিয়া তরুণ যখন সশব্দে নামিয়া গেল, সত্যবতীর মনে হইতে লাগিল, সে-যেন সত্যই সব শেষ করিয়া চলিয়া গেল, আর যেন সে ফিরিবে না। ইচ্ছা হইল, চীৎকার করিয়া ডাকেন, কণ্ঠে স্বর ছিল না। ওষ্ঠ দংশন করিয়া মূঢ়ের মত বসিয়া রহিলেন।

লেজওলা ধূমকেতুর মত এই যে কুগ্রহ-টি পৃথিবীর কলঙ্কিত আকাশ হইতে তাঁহারই গৃহে আসিয়া জুটিয়াছিল, কোনো সংসার-সমাজেই যে কোনো শুভই তদ্দ্বারা সাধিত হইবে না—জানিতেন বলিয়াই সত্যবতীর অম্বার উপর ক্রোধের মাত্রা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছিল। যে মুহূর্ত্তে তরুণের দীপ্ত কণ্ঠস্বরে তাঁহার হৃদয় প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল, তখনি কতই-না বেদনা ব্যথা সেখানে ফুটিয়া উঠিয়া তাঁহাকে ধরাশায়ী করিয়া ফেলিয়াছিল।

তরুণের হৃদয় যখন অম্বার কাছে একেবারে উন্মুক্ত হইয়া গেল, সত্যবতী কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইতে লাগিল—প্রবল বন্যায় নদীর সুউচ্চ পাড় সশব্দে ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে, আর নিষ্কৃতি নাই—নদীর ভাঙ্গনে যে তাহার ক্ষুদ্র গ্রামখানি ভাসিয়া যাইতে বসিয়াছে এ চিন্তা ত কোন গৃহীরই সুখের নয়। মা হইয়া কেন-যে তিনি এ কথা শুনিলেন, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কি ইহজগতে নাই! কতবার ভাবিলেন না-না শুনিবার ভুল হইয়াছে, কিন্তু মন ত প্রবোধ মানে নাই। সে-যে

উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া বলে, ঠিক শুনিয়াছে, এতটুকু ভুল কোথাও নাই।

তাঁহার পুত্রের প্রার্থনা নির্লজ্জা অম্বা অপূর্ণ করিয়াছে—তাহাও ত তিনি শুনিয়াছেন—এক নিমিষের জন্য একটা তৃপ্তির আস্বাদ পাইলেও,বিরুদ্ধ মন যে কোনমতেই তাহাতে সায় দিতেছে না বুঝিয়াই—তিনি নিজের মনেই বলিলেন, এ আর কিছু নয়—এ-যেন ব্যাধের জাল ফেলিয়া বসিয়া থাকা। যতক্ষণপাখীটা ঠিক ফাঁদে পা না দিতেছে, ততক্ষণ ব্যাধ অলক্ষ্যে বসিয়া উপেক্ষাই করিয়া থাকে।

অম্বা যে তরুণের চারিদিকে জাল বিস্তার করিয়া তাহাকে বেশী করিয়া জড়াইতে এই উপেক্ষার ভাণটুকু করিয়াছে, সত্যবতীর মনে হইতে লাগিল, ইহা যেন তাহার পক্ষে অধিক কার্য্যকারী হইয়া উঠিবে। এবং সেই চেষ্টাতেই যে-সে অহর্নিশি ঘুরিয়া মরিতেছে—রমণী সতবতী নারীর এই আকুল তৃষা বুঝিয়াই একেবারে দুর্ব্বার হইয়া উঠিলেন।

আত্মীয়স্বজন, গৃহ, সব ছাড়িয়া যে একটা অল্লাদনের পরিচিত বিদেশী বিজাতীর প্ররোচনায় এত বড় পাপ করিতে পারে সে-যে কোমল হৃদয় তরুণ যুবককে গ্রাস করিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিবে এ আর বিচিত্র কি?

তরুণ বালক—সংসারানভিজ্ঞ তরুণ তাহার কবল হইতে রক্ষা পাইবে কেমন করিয়া—সত্যবতীর নাক-কাণ-মুখ দিয়া যেন তপ্ত অগ্নিশ্বাস বাহির হইতে লাগিল।

সন্ধ্যা হইয়া গেছে, দূরে অদূরের গৃহ হইতে কত শঙ্খধ্বনি

1307

উঠিতেছে, সত্যবতী অলস-কাতর দেহ মন লইয়া সন্ধ্যার দীপ জ্বালিলেন।

অম্বাকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া মনের কোথাও যদি একটুকু কোমলতা ছিল—একেবারে কাঠ হইয়া গেল।

অম্বা ফিরিয়া চাহিতেই বুঝিল, সত্যবতী এখানে আসিয়াছিলেন, কথা না কহিয়াই চলিয়া গিয়াছেন। মাতা-পুত্রের মধ্যে কি ভীষণ প্রভেদ মনে-মনে কল্পনা করিয়া সে উঠিয়া পড়িল। সত্যবতীর অনাদর, উপেক্ষা, ঘৃণা সব সহ্য করিবে ভাবিয়াই যেন উঠিয়া বসিল। আজ সে নিজের মন দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়াছে বলিয়াই পৃথিবীর যাবতীয় লোকের লাঞ্ছনা কোথাও বাজিবে না মনে করিয়া অম্বা বিছানা ছাড়িয়া আসিল। শুধু তাই নয়, একান্ত বিপদের সময় সে আশ্রয় পাইয়াছিল, এবং তরুণ নিজমুখে বলিয়াছে তাহাকে ভালোবাসে—ঠিক এই কথাটাই সে নিজের মনে এই ভাবে না ভাবিলেও, জন্মগত অভ্যাসবলে ক্ষুদ্র কুকুরশাবকের মতই তাহার মন অগাধজলে সন্তরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। জীবনে কোন দিন যাহা অলীক স্বপ্নের বেশী কিছুই ছিল না, আজ তাহারই সত্যসন্ধান পাইয়াছে বলিয়া তাহার মৃত্যু-কামনা হইতেছিল।

এই যে মরুভূমে মরিচিকার মত একটা আলো দিগ্বিদিক ধাঁধাইয়া দিয়া গেল, সে-যে পান্থের কোন উপকারেই আসিবে না, নিজের কলঙ্কিত জীবনের সহিত এমনই একটা রহস্যময় প্রহেলিকা চিরদিন সংসারটিকে তাহার চক্ষের সামনে কৃষ্ণ-যবনিকা টানিয়া তফাৎ করিয়া রাখিবে, ইহা ভাবিয়াই তাহার মনে হইতেছিল—

সে ত জীবন্মৃতই ছিল, আজ আর তাহাও সে থাকিতে চাহে না—আজ সে মরিতে চাহে! কেন?

আমরা জানি, এই যে মরণ কামনা—বাঙ্গালীর মেয়ে কত কারণে, কত রকমেই না করে—অনেকে কেবল কামনা নয়, মরণ আলিঙ্গন করিয়া বাঁচে—সংসারে এমন সব ঘটনা আদৌ বিরল নহে! কিন্তু অম্বা তেমন মরিতে চাহিল না। সব চেয়ে সেরা দুঃখ তাহার হইয়াছিল, যেদিন সে গৃহত্যাগ করিয়াছিল। কি সুখের অন্বেষণে যে সে দুঃখের আবর্ত্তে পা বাড়াইয়াছিল, সেদিন সেই সময়ে ঠিক না বুঝিলেও কাশীতে পৌঁছিতেই বুঝিয়াছিল। কিন্তু সেদিনও ত মৃত্যুকামনা করে নাই। তখন মনে হইয়াছিল—

ভীষণ সমুদ্রেরও বুঝি একটা কূল আছে। আজ তরুণের কক্ষ-ত্যাগের সঙ্গেই তাহার বিশ্বাস জন্মিল, কূল তাহার পক্ষে নাই—থাকিলেও সেই কূলের নিকটেই তরীখানি অসহ ভারে ডুবিয়া যাইতেছে।

সত্যবতী কোথায় ছিলেন, সে জানে না, বিক্ষিপ্ত চরণে ছাদে অন্ধকারে আসিয়া সে-যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়া গেল। এখানে এক ফোঁটা চোখের জল মুছিতে নিজের কাছেই ধরা পড়িতে হইবে না, প্রত্যেক প্রশ্নোত্তরের সঙ্গে কেহ তাহার মুখভাবটি যাচাই করিয়া লইবে না। কেন যে লোক আলো-আলো করিয়া মরে—তাহার কোন কারণই সে নির্দ্দেশ করিতে পারিল না।

ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যে চাপা নিঃশ্বাসের শব্দ শুনিয়াই সে বুঝিতে পারিল, এত যে সাহস-বল সব অন্তর্হিত গেছে, হইয়া

পা দুটি কাঁপিয়া-কাঁপিয়া উঠিতেছে। এবং তাহার এই চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়াই কালো আকাশ অগণিত চক্ষু মেলিয়া সত্যবতীর মতই করুণ দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছে।

একবার মনে হইল, ছুটিয়া পালায়। যে দু'একটা দিন বাধ্য হইয়া এখানে রহে, সত্যবতীর সামনের মাটিতে আর পা দিবে না, কিন্তু পলাইবার ইচ্ছা সত্ত্বেও শক্তি যে এক বিন্দুও ছিল না, অনুভব করিয়াই সে পাশের রেলিঙ ধরিয়া বসিয়া পড়িল।

সত্যবতী বলিয়া উঠিলেন—রেলিঙ ভাঙ্গা আছে।

অম্বা নড়িল না, শুনিতে পাইয়াছে এমন ভাবও দেখাইল না।

সত্যবতী গর্জ্জিয়া উঠিলেন—শেষাশেষি কি হাতে দড়ী দিতে চাও অম্বা!

অম্বা রেলিঙটা ছাড়িয়া, সরিয়া বসিল। আলোক ত্যাগ করিয়া সে-যে অসীম অন্ধকারের মধ্যে আত্মবিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছিল —সেই অন্ধকার কাটিয়া কাটিয়া আগুন যে এমন দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, এ ত তাহার জানা ছিল না। সত্যবতী যে সেখানেও দীপ্ত নেত্র মেলিয়া তাহাকেই ভস্ম করিতে বসিয়াছিলেন, জানিলে প্রদীপের মৃদু আলোক ত্যাগ করিয়া, সে কি আসিত—কখনই আসিত না।

মৃত্যু আসন্ন জানিয়াও মুমূর্ষু যেমন হরিনামের বলেই পুনর্জীবনের আশা ত্যাগ করিতে পারে না, অম্বারও মনে হইতেছিল, তরুণের মুখে সে যাহা শুনিয়াছে—এখন চতুর্দ্দিকের এই অগ্নিদাহে সে মরিতেও পারিবে। জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড যে তাহাকে

চারিদিকে বেষ্টন করিয়া আছে—কোনদিকেই আর তাহার বিরাম নাই—ভাবিয়া সে হৃদয়ের অগ্নি-প্রদাহ লইয়া বসিয়া রহিল। আকাশের যে স্বচ্ছতা ভেদ করিয়া তারার রশ্মি শূন্য ও মর্ত্ত্যের মধ্যপথে আসিয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল, অম্বার মনে হইতে লাগিল—এখনি সেই পুঞ্জীভূত নক্ষত্ররাশির আলোক আগুন হইয়া নামিয়া পড়িবে। এই বিহ্বলতার মধ্যেই সত্যবতীর উগ্রস্বরে তাহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল। সত্যবতীর চোখ-মুখ কিছুই তাহার দৃষ্টিগোচর না হইলেও কথাগুলি কামানের গোলার মত দুর্গ-প্রাচীর ভেদ করিয়া গেল।

কালই যাবে তুমি?"

উত্তর দিবার ইচ্ছা তাহার ছিল, কিন্তু দুর্বিনীত কণ্ঠ সাড়া দিল না।

সত্যবতী কঠিন ভীষণকণ্ঠে বলিলেন—যাবে ত কাল?

যাব।

সত্যবতী বলিলেন—আমার ননদ-পো'কে ডেকে পাঠাব কাল তোমাকে রেখে আসবে। দেশেই যাবে ত তুমি?

অম্বার মনে হইল, এ-যেন শুধু কল্পনার উপরই নির্ভর নয়, সত্যবতী কি তরুণের সঙ্গে তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়াছেন! না, না—সেও কি সম্ভব হইতে পারে?

বলিল—হ্যাঁ, বাড়ীই যাব।

সত্যবতী বলিলেন—বেশ, সে-ই রেখে আস্‌বে। বুঝ্‌লে?

বোঝাবুঝির কথা কিছু ছিল না, কিন্তু দ্বিরুক্তিতে অম্বার মনে

হইল, নিশ্চই তিনি শুনিয়াছেন। ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা! কিন্তু যখন শুনিয়াইছেন, আর সে গোপন করে কেন?—এই ভাবিয়া বলিল—আমি ওঁর সঙ্গে যাব, তরুণবাবু......

সত্যবতী অবাক্ হইয়া গেলেন। এ কথাটা তিনি নিজের কানেই শুনিয়াছিলেন, কিন্তু সে-যে এমনই দৃঢ়স্বরে তাঁহার মুখের উপরই সে কথা বলিবে—এই বা তিনি বিশ্বাস করেন কি করিয়া? পুত্রের ইচ্ছাও জ্ঞাত ছিলেন বলিয়া সহসা কোন কথা বলিতে পারিলেন না।

যদি হায়! অলক্ষ্যে কথাগুলি তাঁহার মর্ম্মভেদ না করিত, তিনি এত উৎকণ্ঠিত হইতেন না। অম্বার নিরপেক্ষভাবটি যদি তাঁহার নিকট ব্যাধের ফাঁদের মতই না বোধগম্য হইত, তাহা হইলেও হয়ত তাঁহাকে এত বিচলিত হইতে হইত না।

আপনি ভাববেন না—কাল আমি তাঁর সঙ্গেই চলে যাব।—বলিয়া অম্বা দ্রুতপদে চলিয়া গেল। যত শিক্ষিত, উচ্চ হৃদয়ই হোক, সত্যবতীর মন একটা নীচ কু-চিন্তায় একেবারে রি-রি করিয়া উঠিল। আজ তিনি ভাবিতে লাগিলেন, যদি দু'টি চক্ষুই অন্ধ হইত, কোন দুঃখ ছিল না—হৃদয়ের প্রয়োজনীয়তা যেন একেবারে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে।

রাত্রে তরুণ আহার করিয়া শুইতে গেল। সে প্রকাশ্যে অম্বার খোঁজ না করিলেও, তাহার ভারানত নেত্রদ্বয় যে থাকিয়া থাকিয়া তার সন্ধানেই ইতস্ততঃ ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে—সত্যবতী তাহা বুঝিয়াছিলেন। মা'র মনের এ যে কত বড় দুর্ব্বলতা,—

যাহার চিন্তাতেও মন বিতৃষ্ণায় কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে, এ-কি দুর্ব্বিষহ লজ্জা যে, তাহাকে ডাকিয়া আনিতে নিজেকেই যাইতে হইল।

সত্যব্রতী নিরূপণ করিতে পারিলেন না, ইহা কেবলমাত্র অতিথিসৎকার কি না!

একুশ

অতি প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গে তরুণ একখানি চাদর গায়ে দিয়া লোকবিরল কল্‌কাতার সদ্যঃজাগরিত রাজপথে বাহির হইয়া পড়িল। স্বাস্থ্যান্বেষী অনেক বৃদ্ধ প্রৌঢ় গ্রীষ্মের ভোরেও আপাদ-মস্তক আবৃত করিয়া হেদুয়ার রেলিঙ-ঘেরা জলের উপরের রাস্তায় ঘুরপাক খাইতেছিলেন, তরুণও কিছুক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইল। হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গে অনেকগুলি শিশুর চীৎকারের মতই ফেরিওয়ালাদের ঘন-ঘন ডাকে, মোটর, ট্রামের ভীষণ শব্দে—ধাক্কা খাইয়া সে পুষ্করিণী ত্যাগ করিল।

তখন বাড়ী ফিরিবার ইচ্ছা হইতেছিল না। বিজয়া দশমীর করুণ বাজনার মতই ভোর হইতেই তাহার মনে অম্বার বিদায়-বারতা যেন তাহাকে পিষিয়া ফেলিতেছিল। একদিন, দুইদিন পরে নয়, আজই সে চলিয়া যাইবে—বিরহ-শঙ্কায় তাহার মন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। মানুষের জীবন শত সমস্যা প্রহেলিকার সমষ্টিই হোক্ না কেন, ইহা যে কখনই সম্ভব হইতে পারে—এ ত অপরিজ্ঞাতই ছিল।

কবে, কখন, কোন্ মুহূর্ত্তে সে এই প্রেম প্রথম অনুভব করিয়াছিল, কিছুই স্মরণ নাই। হৃদয়ের স্তরে-স্তরে যে এই চিন্তাটিই অদৃশ্য বর্ণে চিরস্থায়ীরূপে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে—কখন যে তাহার প্রথম রেখাপাত হইয়াছিল, তাহাও সে জানে না। নিজের মন যে, নিজেরই বিরুদ্ধে এমন ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, তাহা কালকের আগে সে ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে নাই।

কিন্তু এই অনুভূতি প্রকাশের পরেও যে অম্বা তাহাকে সবলে দূর করিয়া দিয়াছিল—ক্ষোভ বা দুঃখ জন্মিলেও—বিশ্রব্ধ শান্তির একটি সূক্ষ্ম রেখা তাহার হৃদয়ে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছিল। কিন্তু সে উল্লাস এত সূক্ষ্ম যে, যখন যেটাকে খুঁজিতে গেল, দেখা পাইল না।

অম্বাকে মুক্তকণ্ঠে বলিয়াও প্রতিদানে উপেক্ষা পাওয়াতেই সে আরো সচেতন হইয়া উঠিল। তাহার মনে নিরন্তর এই কথাটিই বাষ্পের মত কুণ্ডলাকারে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল—অম্বার কি হৃদয় নাই? এমন সুন্দর আবরণের নিম্নে যে কেবল রক্ত মাংসে গড়া একটা পাষাণ খণ্ড পড়িয়া আছে—এ চিন্তাতেও তাহার ব্যথা বাজিতে লাগিল।

সব চেয়ে বেশী যে কথাটাকে লইয়া সে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল, সেই মা'র ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা আর তাহার মনে হইল না। সারাপথ সে শুধু অম্বার হৃদয়ান্বেষণ করিতে করিতে ফিরিল। হৃদয়হীনা স্ত্রীজাতি যে তাহার সর্ব্ব কল্পনার অতীত—এ কথা ত সে ভুলিতে পারিতেছে না।

পৈতৃক ভগ্নপ্রায় গৃহের সম্মুখে যখন সে আসিয়া দাঁড়াইল, বসাকদের ঘড়িটায় ঘং ঘং করিয়া আটটা বাজিতেছে। বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আবার তাহার ভ্রমণেচ্ছা জাগিয়া উঠিল, দুইচার পা গিয়া, ফিরিয়া আসিয়া খট্-খট্ করিয়া কড়া নাড়িতে লাগিল। ঝি দ্বার খুলিয়া দিতেই, ভিতরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসিল, মা কোথা ?

নাইতে গেছেন।—বলিয়া ঝি চলিয়া যাইতেছিল, তরুণের উচ্চকণ্ঠের ডাকে ফিরিয়া চাহিল।

তরুণ জিজ্ঞাসিল—কার সঙ্গে নাইতে গেছেন ঝি, একলা ?

না।

তরুণ এক মিনিট পরে বলিল—সেই মেয়েটিও গেছে বুঝি ?

না, তিনি উপরে—বলিয়া ঝি নিজকর্ম্মে মন দিল।

বাহিরের ঘরটিতে একখানা ভাঙ্গা চৌকী পড়িয়াছিল, তরুণ সেইটির উপরে বসিয়া পড়িয়া ভাবিল—হঠাৎ গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন কেন ? কোনদিনই পুণ্যার্জ্জনে তাঁহাকে সচেষ্ট দেখা যায় নাই ত ! তবে কি এ অম্বার স্পর্শজনিত পাপ ধৌত করিবার উদ্দেশ্যেই এই স্নান-যাত্রা! তাহাই যদি হইবে, অম্বা ত এখনও রহিয়াছে, স্নান করিয়া আসিয়াও স্পর্শদোষ ঘটিতে পারে ত ! না—নিশ্চয়ই অন্য কিছু কারণ আছে। স্পর্শদোষ ভয় যে তাহার মতই সত্যবতীর বেশী ছিল না, তাহা তরুণের চেয়ে কে বেশী জানে ! কিন্তু অন্য কারণই বা কি হইতে পারে ?—সে চৌকিতে হেলান দিয়া তাহাই ভাবিতে লাগিল।

ঝি কাজ সারিয়া দরজার বাহিরে বসিয়া রৌদ্রাধিক্য লক্ষ্য

করিতেছিল, তরুণ তাহা দেখিয়া বলিল—তোমার কাজ হয়নি ঝি ?

হ'য়ে গেচে বাবু। একটু থামিয়া বলিল—মা মানা করে গেছেন।

কি-মানা করে গেছেন ?

ঝি বলিল—তিনি না ফিরলে ঘরে যেতে মানা করেছেন।

তরুণ বলিল—তুমি যাও, আমি এসেছি।

ঠিকা ঝি হইলেও অনেকদিন হইতে এই বাড়ীতে সে কাজ করিতেছে। গৃহিণী কেবলমাত্র একা-ঘরে অম্বার রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই থাকিতে বলিয়া গিয়াছিলেন, এবং এক্ষণে সে সুরক্ষিত ভাবিয়া উঠিয়া পড়িল। আর দুই স্থানে সে ঠিকা কাজ করে—বেলা বাড়ার সঙ্গেই তাহার ভয় হইতেছিল যে আজ দুঃখ ভোগ এবং দুঃখদান দুই-ই তাহার কপালে লেখা আছে।

তরুণ ভাবিল, সে ইতস্ততঃ করিতেছে, বলিল—যাও, আমি বলছি।

ঝি প্রসন্নমুখে চলিয়া গেল। তরুণ উঠিয়া দ্বারটি অর্গলবদ্ধ করিয়া দিল। আবার চৌকীখানিতেই বসিয়া পড়িল।

অম্বা নীচে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, দ্বারপার্শ্বে তাহারই নিঃশ্বাসের শব্দে তরুণ লাফাইয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, অম্বা দেওয়ালে চাবি দিয়া কি-যেন দাগ কাটিতেছে। একা-ঘরে শেষদিনের জন্য অম্বাকে একাকী পাইয়া তরুণের মন যেন একেবারে লাফ দিয়া উঠিল।

অম্বা হাতটি নামাইয়া তরুণের গৌরবর্ণ দেহের পানে চাহিয়া, তখনি চক্ষু নামাইয়া লইল।

তরুণ বলিল— আজ যাবে, অম্বা ?

আজ আর অম্বা প্রগলভের মত 'যাব' বলিতে পারিল না। কাল সারা রাত্রি সে ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারে নাই—সর্ব্বাঙ্গে অবসাদ ক্লান্তির কালো দাগগুলি মুখে-চোখে ফুটিয়া রহিয়াছে। নিজের চেহারা কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তরুণের কক্ষপ্রাচীর-বিলম্বিত মুকুরে দেখিয়াছিল, তাই সে আর মুখ তুলিতে পারিল না, জবাবও দেওয়া হইল না।

কিন্তু সেই একবারের দৃক্‌পাতেই তরুণ তাহার মুখের কালী দেখিতে পাইয়াছিল। পরের দুঃখে দৈন্যে চিরকাল তাহার হৃদয়ে ব্যথাই বাজিত, আজ যেন একটা আনন্দ-রাগিণীর শেষ মূর্চ্ছনা লুপ্তপ্রায় মাধুরীর সহিতই তাহাকে নাড়া দিয়া দিল।

একমুহূর্ত্ত পরে বলিল—কি-বল অম্বা! যাবে ?

অম্বা বলিল—যাব। সেই ব্যবস্থাই করতে গেছেন।

ব্যবস্থা কিসের অম্বা ? আমিই ত তোমাকে রেখে আসব বলেছিলুম, আবার কিসের ব্যবস্থা!—এ কথা কয়টি যেন সে নিজেকেই জিজ্ঞাসা করিল।

অম্বা তাহার উত্তর দিল—আপনার সঙ্গে যাবার ভাগ্য আমার হ'বে না। বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল।

এক ত পূর্ব্বাবধি যথেষ্ট বিস্ময় সঞ্চিত হইয়াছিল, এখন যেন একেবারে দুর্বহ, দুঃসহ হইয়া উঠিল। সে বিচলিতস্বরে বলিল—

আমার সঙ্গেই তুমি যেতে চাও ? বল অম্বা, কেবল ঐ কথাটাই বল। কেউ তা রোধ করতে পারবে না।

এ-যে বিদ্রোহীর কণ্ঠস্বর, অপূর্ব্ব পরিচিত হইলেও অম্বা বুঝিতে পারিল। কি ভাবিয়া বলিল—যেতেই যখন হ'বে—কোথায় যে—তারই যখন ঠিকানা নেই—তখন আর সঙ্গী বাছাবাছি কেন ?—তাহার কপোল বহিয়া টপ্ টপ্ করিয়া অশ্রু-বিন্দুগুলি মাটিতে পড়িতে লাগিল।

তরুণ বলিল—তবে যাচ্ছ কেন, অম্বা!

এ প্রশ্ন যে কত জটিল এবং তাহার উত্তর যে কোন অবস্থাতেই কোন রমণী দিতে পারে না, অম্বার সজল চক্ষু দুইটি কেবল এই ভাবই প্রকাশ করিল। তরুণ বুঝিল না, সে গদগদ স্বরে বলিল—থাক অম্বা, চিরদিন এই অন্তঃপুরে থাক তুমি! তোমাকে আমি যেতে দিতে পারব না!

এ-কি অশ্রু-স্রোত—কোনমতেই সে-যে কমে না। অম্বা মুখ তুলিতে পারিল না।

তরুণ তাহার নিকট আসিয়া বলিল—থাক অম্বা!—একটু জোর করিয়াই বলিল—থাকবে ?

অম্বা বলিল—কেমন করে থাকব! আমাকে যে রাখতে নেই...

কে বলেছে রাখতে নেই। তুমি থাক—আমার কাছে তোমার অপরাধ নেই। অম্বা!

মা...

সে বোঝাপড়া আমি তাঁর সঙ্গে করব। তুমি শুধু বল—থাক্‌বে?

থাক্‌ব—কিন্তু তরু—সে আর বলিতে পারিল না।

তরুণ সাগ্রহে বলিল—কি বল্‌ছিলে অম্বা?

আজ আর সে নাম করিতে পারিল না—কে যেন হাত বাড়াইয়া তাহার গলাটি চাপিয়া ধরিয়াছিল। বক্তব্য অব্যক্তই রহিয়া গেল, চক্ষের জলে মুখ ভাসিয়া গেল।

বাহিরে কড়া নড়িয়া উঠিতেই সবলে আত্মমুক্ত হইয়া সে উপরে উঠিয়া গেল।

বাইশ

এমন একটা সময় মানুষের জীবনে অকস্মাৎ আসিয়া পড়ে যখন সহ্যের সীমা একেবারেই ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায়। শুধু মানুষের জীবনেই নয়, জাতির জীবনেও এমন মুহূর্ত্ত আসে যখন সহ্য করা নিরবচ্ছিন্ন শান্তির চিহ্ন বলিয়া মনে হয় না বরং কাপুরুষতারই পরিচয় দেয়। জগতের ইতিহাসে এমন ঘটনা আদৌ বিরল নহে। এই বিদ্রোহ কতরকমেই না প্রকাশ হইয়া পড়ে—বিবেচনা শক্তি শিথিল হইয়া যায়—চিরশান্ত জাতিও একেবারে দুর্ব্বার হইয়া উঠে।

সত্যবতীর সন্দিগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়াইয়া তরুণ বক্ষের তপ্ত রক্ত স্রোত রুদ্ধ করিতে সচেষ্ট হইতেছিল, কিন্তু শেষে এমন

অবস্থা দাঁড়াইল যে, পরে স্বকৃত অপরাধের অনুশোচনায় মাথা রাখিবার স্থান আর কোথায় দেখিতে পাইল না।

সত্যবতী ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—ঝি কোথা গেল? তা'কে যে আমি বসিয়ে রেখে গেলুম।

তরুণ বলিল—আমি তাকে যেতে বলেছি।

সত্যবতী এ-রকম উত্তরের প্রত্যাশা করেন নাই, তাই বিচলিত হইয়া পড়িলেন—বলিলেন—অম্বা কোথায়?

তরুণের বুকে রক্ত টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া উঠিল, সে বলিল—এইমাত্র উপরে গেল।

সত্যবতী ধৈর্য্য হারাইলেন, চীৎকার করিয়া বলিলেন—সেই জন্যই ঝিকে বিদায় দিয়েছ?

তরুণ কথা কহিল না। এত বড় মিথ্যা অপবাদেরও প্রতিবাদ করিতে পারিল না।

সত্যবতী পুনরায় বলিলেন—তাই ত বলি, বুড়ী গেল কেন? আমার বারণ...

আমি তা'কে যেতে বলেছি, তবে সে গেছে।

কিন্তু কেন—সেইটেই আমি জান্তে চাই, তরুণ। শুধু যে জান্তে চাই তা নয়—এর একটা শেষও আমি করতে চাই!

কি শেষ করতে চাও?

তোমাদের এই লুকাচুরীর। এ-যে আমি ভাবতেই পারি নে...

তরুণ বসিয়াছিল, দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—সব জিনিষ সকলে

বুঝতে পারে না, অনেক জিনিষ বঝবার ক্ষমতা না থাক্‌লে চেষ্টা করাও ধৃষ্টতা হয়ে পড়ে।

সত্যবতী বিস্ময়-স্তম্ভিত নেত্রে কয় মুহূর্ত্ত পুত্রের পানে চাহিয়া বলিলেন—কিসে তোর সাহস এত বাড়ল তরুণ যে তুই আমার সঙ্গে সমান উত্তর করিস্‌?

তরুণ ব্যঙ্গ করিয়া বলিল—তুমিই বাড়িয়ে তুলেছ মা। তুমি যদি এমন করে’ আমাকে অবিশ্বাস করে…

সত্যবতী দর্প করিয়া বলিলেন—আমি এমনই অবিশ্বাস করেছি! আমি যে নিজের কানে শুনেছি—কথাটা বলিয়াই তিনি মুখ ফিরাইয়া লইলেন। যেন অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও কথাটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

তরুণ বলিয়া উঠিল—কি শুনেছ? স্পষ্ট করে বল।

সত্যবতী বলিলেন—স্পষ্টই বল্‌ব। ভয় কিসের? হারে অদৃষ্ট, তোকে ভয় করেও আমাকে বেঁচে থাক্‌তে হ’বে। তার চেয়ে কেন আমি মরি না!

সত্যবতীর কণ্ঠ আর্দ্র হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সে দৌর্ব্বল্য তিনি তরুণকে জানিতে দিলেন না, পাছে কাতর মুখ দেখিয়া তরুণ স্তব্ধ হইয়া যায়—এত দুঃখের মধ্যেও পুত্রের সস্নেহ হৃদয়ালুতার কথা মন ছাড়িয়া যায় নাই বলিয়া তিনি চাহিতে পারিলেন না।

তাঁহার মনে হইল, তাঁহার সজল চোখের দৃষ্টিতে তরুণ হয়ত সব সঙ্কল্প ভাসাইয়া দিতে পারিবে, কিন্তু হৃদয় ত অনুমোদন

করিবে না, হৃদয় যদি সানন্দে তাহা গ্রহণ করিতে না পারিল তবে আর মীমাংসা হইল কিরূপে ?

অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া দৃপ্তস্বরে বলিলেন—কি করতে চাস তুই—ঐ মাগীটাকে নিয়ে ?

আহত বন্যশূকরের মত তরুণ গর্জ্জাইয়া উঠিল, বলিল—তাকে আদর না করতে পার, অসম্মান করবার অধিকার তোমার নেই, মা। অন্ততঃ আমি তোমাকে তা করতে দেব না।

তরুণের মুখে এই কথা! সত্যবতীর ধৈর্য্যের বাঁধ টুটিল, শেষ চেষ্টা করার মত বলিলেন—আমি তাকে যদি না নিই, কি করতে পারিস তুই! নেওয়া না নেওয়া আমার ইচ্ছে, তার ওপর জোর খাটাতে কেউ পারবে না। তা জানিস।

জানি।—কিন্তু চেঁচিও না। ছোট গলিতেও লোক চলাচল সকাল বেলায় কম থাকে না মা।—বলিয়া সে চুপ করিল, কিন্তু কথাটা যেন শেষ করা তাহার অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল, উচ্চ অথচ ভরা গলায় বলিল—এক কথা তোমাকে বলে দিই মা। অম্বার যখন সম্মতি পেয়েছি—অন্য কোন বাধাই আমি মানব না।

সত্যবতী বলিলেন—কি করবি ?

তরুণ বলিল—সে তুমিই ভালো করেই জান। নইলে আগলাবার এত সুব্যবস্থা করেছিলে কেন?—জান বলেই ত! কিন্তু সে চেষ্টা তোমার বিফল হয়েছে মা। আমার এ সঙ্কল্প আমি ত্যাগ করতে পারব না।

সত্যবতী কি ভাবিলেন, একমিনিট পরে বলিলেন—এই তোমার ব্রহ্মচর্য্য! ভণ্ড।

ভণ্ড বল' না, আর যা খুসী বলতে পার—ভণ্ড নই। এর চেয়ে সাধুতা হয়ত অনেক আছে, কিন্তু এ-যে কোনটিরই কর্ম্ম নয়, এটাও আমার মতই তুমি জান। আর ব্রহ্মচর্য্য!—ভাঙতে মা হ'য়ে তুমিই চেষ্টা কর নি কি?

সত্যবতীর মাথায় যদি বাজ ভাঙ্গিয়া পড়িত, তিনি এত বিস্মিত হইতেন না। মা'র মুখের উপর এ-কি নিদারুণ অপবাদ!

তরুণ বলিতে লাগিল—কর নি? এখন বোধ হয় মনে করতে পারবে না। তোমাদের স্বভাবই এই!

সত্যবতী ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিলেন, চৌকীর একধারে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন—স্বভাবই এই!

নয়ত কী! আজ ত আর মনে করতে পারছ না যে ঘটক ঘটকীর কি-রকম আমদানী-রপ্তানিটা সুরু করে দিয়েছিলে! সে কিসের জন্যে মা! মহাভারত রামায়ণ ঘেঁটে কত উদাহরণ যে আমার সামনে ধরতে—কোন্ রাজা কেবলমাত্র সহধর্ম্মিণীর গুণেই কখন রাজ্য, কখন মান, কখন স্বর্গ পেয়েছিলেন। এতবড় তোমার ধর্ম্মগ্রন্থের থেকে একটা বিপত্নীক পুরুষের গল্পও কখন বলতে না।—এসব যদি ব্রহ্মচর্য্য ভাঙার চেষ্টাই বলি, বড় বেশী কথা হবে কি!

সত্যবতী বলিলেন—এই কথা তুই বল্লি তরুণ...

তরুণ দেখিবে না বলিয়াই চাহিল না। কণ্ঠস্বর সাধ্যমত কঠিন করিয়া বলিল—আমি বলি নি, তুমিই বলিয়েছ। তুমিই আলোচনা জাগিয়ে এমন করে দিয়েছ, যে তার হাত থেকে অম্বাকে বাঁচানো শুধুই আমার কর্ত্তব্য নয়—ধর্ম্ম।

সত্যবতীও ক্ষণিকের দৌর্ব্বল্য ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন—এতবড় ধর্ম্ম কোথায় শিখেছ তরুণ যে মা'কে ব্যথা দিতে পার! সাধু পুরুষ! নির্ম্মল চিত্ত কি-না এক কুলটার...

তরুণ বাধা দিয়া বলিল—ব্যস—খুব হয়েছে—চুপ কর।

অম্বা এই সময়েই ঘরে পা দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সত্যবতী তন্মুহূর্ত্তে কক্ষ ত্যাগ করিলেন। তরুণও আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, মাতালের মত অম্বার হাতটি ধরিয়া ফেলিল। অম্বা বাধা দিল না—তরুণী যুবতীর হৃদয় তখন কূলে কূলে মথিত হইয়া উঠিতেছিল। এই সমুদ্রমন্থনের মতই ভীষণ দৃশ্য পাছে নিজেরই চোখে পড়িয়া অন্ধ হইয়া যায়—সে চক্ষু মুদ্রিত করিল। তরুণও ঝড়ের মত ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

অম্বা হাতের মধ্যে হাত চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া পড়িল।

তেইশ

এগারোটা বাজিয়া গেল, তরুণ ফিরিল না।

সেই লজ্জাকর অভিনয়ের পরই সত্যবতী নিজের ঘরের মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতেছিলেন। কান্নার শব্দে তিনি নিজেই মরমে মরিয়া যাইতেছিলেন। সর্ব্বকল্যানাধার তরুণ যে তাঁহাকে

এ বিষম দুঃখ দিবে—এ-যে তিনি কোনদিন দুঃস্বপ্নেও দেখিতে পান নাই। আগ্নেয়-গিরির আগুন কি এতদিন তাঁহাকে পুড়াইয়া ফেলিবার জন্যই সঞ্চিত হইতেছিল? এ আগুনের জ্বালা বেশী, একেবারে ভস্ম করিবার শক্তি তাহার নাই।

সে কতদিনের কথা! তিন বৎসরের শিশু তরুণকে বুকে করিয়া নারীজনমের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন পতি-দেবতাকে বিদায় দিয়াছিলেন! নারীজীবনটাকে কে যেন ছুরি দিয়া কুচি-কুচি করিয়া কাটিতেছিল, সে এই তরুণ প্রলেপ দিয়াই না তিনি অবহ জীবন ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। কত দীর্ঘ বিনিদ্র রজনী সেই ক্ষুদ্র মুখের পানে অনিমেষে চাহিয়া কাটাইয়া দিয়াছিলেন; কত সুখ দুঃখের দীর্ঘশ্বাসগুলি কত সঙ্গোপনেই না হৃদয়ে পুরিয়া-ছিলেন—সব যেন একটি একটি করিয়া অন্তরতম নেত্রে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। হায়! নারীজন্মটা যে তাঁহার ব্যর্থ ই চলিয়া যায়!

নারীত্বের শ্রেষ্ঠ চরম আসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও এ কি মর্ম্মন্তুদ জ্বালা তাঁহাকে সহিতে হইতেছে; স্বকৃত জন্মজন্মান্তরের কত পাপেরই না এ গুরু শাস্তি, ভাবিতেও ভীষ্মের শিখণ্ডী দর্শনের মতই মৃত্যু-ইচ্ছা হইতে লাগিল।

নিজের মৃত্যুবাঞ্ছা অতি প্রবল হইলেও দ্বিপ্রহর হইয়া গেল—তরুণকে অনুপস্থিত দেখিয়া সত্যবতী মাটি ছাড়িয়া উঠিলেন। সেই কাণ্ডের পরে তরুণকে চোখে দেখিতেও তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিতেছিল,—এখনই একেবারে তাহারই অদর্শনে হাহাকার করিয়া উঠিল। কতবার না মনে হইতেছে যতক্ষণ না আসে

মঙ্গল; তিনি-ত তাহাকে কোন সম্ভাষণই করিয়া লইতে পারিবেন না; তবে কেন সেই লজ্জার কুণ্ডে ঝম্প দান—কিন্তু এখন তাহারই দর্শন আশায় লালায়িত হইয়া পড়িলেন।

তরুণ যে রাগ করিয়া বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না, যেখানেই থাকুক্—দশ মিনিট না যাইতেই ছুটিয়া আসিয়া বলে—আমাকে মাপ কর মা! আজ চারঘণ্টা কাটিয়া গেল, সে আসিল না;—এ সময়ে তিনি আর উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। একবার মনে হইল, তাহাকে সর্ব্ব-অকল্যাণের মূলে যে, তাহাকে!—আবার মৃত্যু ইচ্ছা জন্মিল।

যম সদয় হইল না, নির্দ্দয় হইয়া গদাটিতে বিদ্যুৎ ঠেসিয়া পাঠাইয়া দিল—তাঁহাকে দণ্ড দিতে!

সে-যে এইখানেই কোথায় বসিয়া সগর্ব্বে ভাগ্য পর্য্যালোচনা করিতেছে, মনে হইতেই সত্যবতী জ্বলিয়া উঠিলেন। এই অমঙ্গলময় পাবকশিখাকে একদিন যে হাতে ধরিয়া গৃহে তুলিয়াছিলেন আজ মনে পড়িতে নিজেরই প্রতি ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

সত্যবতী উঠিয়াছিলেন, আবার বসিয়া পড়িলেন। সে-থাকিতে এ গৃহে বাস করাও যে তাঁহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব—এ ধারণা বদ্ধমূল ছিল বলিয়াই আর উঠিতে ইচ্ছা হইল না।

কিন্তু তেমন ভাবে থাকা হইল না,—তরুণ এখনই যদি আসিয়া পড়ে, রান্না হয় নাই, খাইতে পাইবে না, ভাবিয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেলেন।

নামিয়া যাহা দেখিলেন—বিস্ময় রাখিবার আর স্থান ছিল না!

এরকম যেকোন দেশের কোন কঠিন পুরুষও করিতে পারে সত্যবতীর তাহা অজ্ঞাত ছিল। দেখিলেন, রান্নাঘরের উনানে আগুন দিয়া অম্বা বাতাস করিতেছে। সামনে সুপ্তোত্থিত বাঘ দেখিয়াও হরিণী এত বিস্মিত হয় কি-না সন্দেহ। সত্যবতীর চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল।

সে-চোখ-দুইটির হিংস্র জ্বালা অম্বার মুখখানাকে পুড়াইয়া দিল; সর্ব্বাঙ্গ পুড়িবার উপক্রম হইতেছে জানিয়াও সে আসন ছাড়িয়া উঠিল না। সত্যবতী নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতেই অম্বা চক্ষু মুদ্রিত করিল।

কোন একটা ছোট কথায় আরম্ভ করিবার মত মনের জোর সত্যবতীর ছিল না,—কণ্ঠস্বরে উগ্র বিষ মিশাইয়া বলিয়া উঠিলেন—উঠে যাও অম্বা।

অম্বা প্রত্যাশিত অথচ অনাকাঙ্ক্ষিত উগ্রস্বরে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। হৃদয়ের এক প্রান্ত পর্য্যন্ত যে প্রদাহ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল, তাহারই উত্তপ্ত ঝাঁজে সে চক্ষু তুলিতেই পারিল না।

সত্যবতী অধিকতর কর্কশকণ্ঠে কহিলেন—উঠে যাও অম্বা।

অম্বা উঠিয়া পড়িল। দ্বারের কাছ পর্য্যন্ত গিয়াছে, সত্যবতীর স্বরে আবার স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

সত্যবতী বলিলেন, আর তুমি আমার ঘরে ঢুক' না।

অম্বা কি-একটা কথা বলিল, কিন্তু নিজের কাণেই তাহা গেল না, সত্যবতীও শুনিতে পান নাই! একবারমাত্র অম্বার ঘৃণিত

মুখের পানে চাহিয়া ছোট একটি পিত্তলের ঘটি হইতে গঙ্গাজল ঢালিয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিলেন।

অম্বা তাহাও দেখিল ছুটিয়া বাহিরের অন্ধকার ঘরটিতে ঢুকিবে চৌকীর উপর আছাড় খাইয়া পড়িল। নিজের ভয়াবহ অবস্থায় নানারূপ কুৎসিত কল্পনা সে কতদিন মনে মনে করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু তাহার বিচরণের স্থানটিতে যে কেহ গঙ্গাজল ছিটাইয়া শুচি-শুদ্ধ করিবে, ইহা সে ভাবে নাই। হিন্দুগৃহে পালিত কুকুরের জন্যও যে একটুখানি শুচিতা ত্যাগ করিতে পারে—সত্যবতী তাহার জন্য সেটুকুও পারিলেন না দেখিয়া সে আর সহ্য করিতে পারিল না।

মানব-হৃদয়ের এ কি ভীষণ সঙ্কীর্ণতা! একদিন যে সত্যবতীর পাশে বসিয়াই তরুণের আহার্য্য প্রস্তুতের সাহায্য করিতে পারিল, আজ তাহারই স্পর্শে ঘরখানাও যে এমন অশুচি হইয়া পড়িবে, আচারের শুচিতায় নিজের সর্ব্বাঙ্গের কালী যেন হাসিয়া ভ্যাংচাইয়া উপহাস করিতে লাগিল।

এ যে কেবলমাত্র শুচিতা রক্ষা নহে, ইহার তলে আরও সুগভীর একটা কিছু আছে তাহাও অম্বা বুঝিতে পারিল। সকালের সেই কাণ্ডটা সে দেখিয়াছিল, সেই বিশ্রী অভিনয়ের ইহা যে শেষাংশ ছাড়া আর কিছুই নহে, তাহাও বুঝিতে তাহার বিন্দুমাত্র দেরী হইল না।

তরুণের বিদ্রোহেই যে সত্যবতীর শুদ্ধান্তঃশুচিতা সজাগ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও সে বুঝিতেছিল। কিন্তু পক্ষাঘাতগ্রস্থের মত

কোনদিকে ভাবিবার মত তাহার কিছুই ছিল না বলিয়া নিজের দুর্ভাগ্যালোচনা করিতেই সে মৃতার মত পড়িয়া রহিল।

এদিকে মধ্যাহ্নতপন পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িতেই সত্যবতী দুপ-দাপ করিয়া ঘর-বাহির করিতে লাগিলেন। অম্বার মনের অবস্থা বুঝিবার শক্তি তাঁহার ছিল না; সে-যে নিশ্চিন্তমনে শুইয়া আছে, মাতাপুত্রের এই বেড়া আগুন জ্বালাইয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছে—এ দৃশ্যে তাঁহার বুকটা শৃঙ্খলাবদ্ধ কেশরীর মত গর্জ্জন করিতে লাগিল।

এমন সময়ে চিরপরিচিত কড়ার শব্দে ছুটিয়া দ্বার খুলিয়া দিতেই হাসিমুখে নিরঞ্জন প্রবেশ করিয়া—এই যে মামী, এসেছি—বলিয়া মামার মুখের পানে চাহিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

সত্যবতী তাহাকে দেখিয়া একেবারে কাঁদিয়া উঠিলেন।

নিরঞ্জন অবাক্ হইয়া গেল। মামী গঙ্গাস্নান করিয়া, তাহাদের বাড়ী গিয়াছিলেন এবং বিশেষ প্রয়োজনে আসিতে বলিয়াছিলেন এই বারঘণ্টার মধ্যে কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে—বুঝিতে না পারিয়া মামীর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। চৌকীর উপর শায়িতা যুবতীর দিকে চাহিয়া সবশুদ্ধ যেন একটা ধাঁধা-বিভ্রমে নির্ব্বাক্ হইয়া গেল।

সত্যবতী তাহার সঙ্গেই অম্বাকে পাঠাইয়া দিবেন বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, কিন্তু এখন তাহাকে কোনমতেই যে তিনি বিদায় করিয়া দিতে পারেন না—ভাবিয়া ক্ষোভে দুঃখে অধর দংশন করিয়া কান্না বোধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

নিরঞ্জন বলিল, মামী কি-যে দরকার বলেছিলে....

সত্যবতী ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, আর তার দরকার নেই, নিরঞ্জন।

নিরঞ্জনের কণ্ঠস্বরে অম্বা উঠিয়া বসিয়াছিল, একটা অপরিচিত লোকের সপ্রশ্ন দৃষ্টির গ্রাস হইতে পলায়ন করিতে সে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

নিজের আলোচনাটা যে কুৎসিত আকারে ইতিপূর্ব্বেই তাহার হৃদয় ভেদ করিয়াছিল, এখন তাহার পুনরুল্লেখের সম্ভাবনা জানিয়াও আর সে দূরে পলায়ন করিল না। এই অদৃষ্টপূর্ব্ব যুবকটির পরিচয়-প্রশ্ন এবং সত্যবতীর সংযত কণ্ঠস্বর সব সে শুনিতে পাইল। আরও শুনিবার আশাতেই যেন সে পা দু'টিকে জোরযত্নেই দাঁড় করাইয়া রাখিল।

নিরঞ্জনকে বিদায় দিয়া সত্যব্রতী সেইখানেই বসিয়া রহিলেন। তরুণের অদর্শনে যে দুশ্চিন্তা হৃদয় মন্থন করিয়া ফিরিতেছিল, নিরঞ্জন তাহার একবিন্দুও জানিতে পারিল না।

আশা ও নিরাশার, আলো-আঁধারের যে একটা গোপন লীলা তরঙ্গায়িত হইতেছিল, নিরঞ্জনের প্রস্থানের পরই তাঁহার হৃদয় কাঁচের বাসনের মত ঝন্ ঝন্ শব্দে ভাঙ্গিয়া গেল। যে আসিবার সে ত আসিতেছে না—কোন কারণেই যে সহ্য হইলেও জননীর কাছে একান্ত এ চিন্তা সহনীয় হইতে পারে—তাহা ত নয়। যদি তরুণ আর না ফেরে—এ চিন্তাও যে মর্ম্মবিদ্ধ করিয়া দেয়।

সে-যে কোন কারণেই এত নির্দ্দয় হইতে পারিবে—ইহাও বিশ্বাস করা যেমন শক্ত, ঘটনা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে—অবিশ্বাস করাও ত চলে না।

একবার হঠাৎ তাঁহার মনে হইল—সকালের কাণ্ডটা না ঘটিলেই সর্ব্বথা মঙ্গল হইতে পারিত! সে যদি সেই অত্যাচারেরই নির্ম্মম প্রতিশোধ লইতে বসে তবে তিনি কোথায় দাঁড়াইবেন! স্বামী-পুত্র-হীনা অসহায়া বিধবা—এত বড় দুঃখভোগ তিনি সহ্য করিবেন কিরূপে?

তাঁহার দিন ত ফুরাইয়াছিল, তরুণের ইচ্ছার নিম্নে নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা দমন করাই যে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ছিল এবং সে কর্ত্তব্যচ্যুত হইয়া এই অনন্ত দুঃখরাশির মূলে যে তিনিই, যাহার সবটা ভরিয়া কেবল অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আছে—ভাবিতেও সত্যবতীর হৃদয়মন হাহারব করিতে লাগিল।

চব্বিশ

বেলা তিনটা বাজিবার পর তরুণ বাড়ী ফিরিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গে কালী ভরিয়া গিয়াছে। যে অনাবৃত গৌরসুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া সত্যবতী কতদিন স্বর্গগত পতির প্রতিমূর্ত্তি কল্পনা করিয়া সুখভোগ করিতেন, আজ তাহার সে দেহে দৃষ্টি পড়িতেই হৃদয় বসিয়া গেল।

তরুণ কোনদিকে না চাহিয়াই বলিল—অম্বা কোথায়?

এবং উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই উপরে উঠিয়া গেল। অম্বার নিকটে আসিয়া বলিল, চল অম্বা, সব ঠিক করে এসেছি—এই দেখ, টেলিগ্রাম করে জবাব পর্য্যন্ত আনিয়েছি।

অম্বা মুখ তুলিল মাত্র। সাদা কাগজখানার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

তরুণ বলিল, আমিও তাই আশা করেছিলুম অম্বা, যে পৃথিবীর আর কোথাও যার স্থান নেই, আমার গুরুর চরণাশ্রয় থেকে সে বঞ্চিত হবে না। রাত্রের গাড়ীতেই যাই চল দু'জনে!

অম্বা তাহার কথার প্রথমাংশ শুনিতে পায় নাই, শেষটা শুনিয়াছিল— বলিল— কোথায়?

আশ্রমে। আমাদের দু'জনেরই স্থান হবে সেখানে! চল। অম্বা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সত্যবতী পরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিলেন, তোকে কোথাও যেতে হবে না তরুণ। তোরা এখানেই থাক্—যেতে হয় আমিই যাব।

তরুণ মায়ের মুখের পানে চাহিতেই সত্যবতী আবার বলিলেন, আমারই ভুল হ'য়েছিল তরুণ। সংসার আমারই ত্যাগ করা উচিত—আমিই যাব।—বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষুদ্বয় জলে ভরিয়া গেল।

তরুণ একমুহূর্ত্ত কথা কহিতে পারিল না, পরে বলিল—না-মা, সব দিক দিয়ে বুঝেছি......

তাহার কথা শেষ না হইতেই অম্বা বলিয়া উঠিল—কেউ যাবে না, তরুণ বাবু, আমিই যাব। একদিন কুগ্রহের মত এসেছিলুম, আমিই যাব।

সত্যবতী কি বলিতে যাইতেছিলেন, অম্বা তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল—আমাকে বিদায় দিন, মা।

তরুণ বলিল, সে হয়-না অম্বা। আগে যদি তুমি যেতে চাইতে বারণ করবার ক্ষমতা আমারও ছিল না, কিন্তু আজ আর তা হয়-না।

কেন হবে না! আমাকে আপনি আটকাতে পারেন?

তাহার আকস্মিক উগ্রস্বরে তরুণ যেন চেতাইয়া উঠিল, হাঁ করিবার আগেই অম্বা পুনরায় বলিল, এ-যে হয়, হতে পারে এবং এই হ'লেই সবদিকে যে মঙ্গল হয় এ আপনিও জানেন,—

আমি কি জানি?

সবই জানেন—শুধু যে জানেন তা নয়—আজ জেদ চ'ড়ে গেছে বলে আশা করেও সে'টি হ'তে দিতে আপনার ইচ্ছে নেই—এই-না?

তরুণ বলিল, তুমি আমাকে অবিশ্বাস কর অম্বা!

অম্বার মুখখানি মেঘাবৃত শরচ্চন্দ্রের মত মলিন হইয়া গেল, রক্তশূন্যমুখে বলিল—না, আপনাকে অবিশ্বাস আমি করি নে, সে স্পর্দ্ধা আমার নেই। কিন্তু এ ত অবিশ্বাসের কথা হ'চ্ছে না।

তরুণ কি যেন বলিতে গেল, সত্যবতীকে দেখিয়া থামিয়া গেল। অম্বা এটি লক্ষ্য করিয়াই বলিল, একি ভোলবার কথা তরুণ বাবু যে এই পতিতা, নারকী অম্বা কেবল আপনারই অভয় আশ্রয় পেয়ে কাশীর গঙ্গায় ডুবে মরবার ইচ্ছা জলাঞ্জলি দিয়েছিল! এ ত শুধু গল্প নয় যে সেই পতিতাকেই গৃহে স্থান দিয়ে তার সমস্ত

পাপ ধৌত করে দিয়েছেন এক আপনি! এ-যে কত বড় মহত্ত্ব, হৃদয়ের এ কি উচ্চতা, তা ত আমরণ আমি ভুলতে পারব না।

তবে অম্বা—

অম্বা সে কথায় কাণ না দিয়াই কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—কিন্তু এ ত শুধু হৃদয় নয় যে অনুভব করা চলে—সংসার, প্রত্যক্ষ সংসার ত আমাদের মাপ করতে পারবে না।

সত্যবতী আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিলেন না। অম্বার মনের এ পরিচয় পাইয়াও তিনি যেন স্থির করিতে পারিতেছিলেন না—এ কথার ভিতরে কোথাও এতটুকু সত্যও বিরাজ করিতেছে কি না। অথচ এ-যে মিথ্যা নয়—তাহার তপ্ত কণ্ঠস্বর, তাহার স্থির অনিমেষ দৃষ্টি—এ সবই তাহা সুস্পষ্ট করিয়া দেছে।

অম্বা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই বাহিরে পা ফেলিয়া বলিল—মা! আশ্রয় অন্বেষণে অভিশাপের মত একদিন আপনার ঘরে এসে দাঁড়িয়েছিলুম, ব্রহ্মশাপের মতই আমার আগমনে আপনার সুখের শান্তি একদম নিঃশেষ হ'য়ে গেছে—সে অতীতের কথা। তখন কোথাও এতটুকু স্থান আমার ছিল না—ভালো-মন্দ কোন চিন্তাই আমি করতে পারি নি—কিন্তু আজ তা আমার সামনে একেবারে সাফ্ হ'য়ে গেছে। আসবার সময়ও যেমন উদ্গ্রীব হ'য়ে এসেছি, যাবার সময়ও তেমনি চলে যাচ্ছি।

সত্যবতী কথা কহিলেন না। আজ সে বিদায় লইলেও তাঁহার সঙ্গেই যে গৃহের শান্তি ও দীপ্তি সমভাবেই বিদায় লইবে—

সে ক্ষতিপূরণ যে কিছুতেই বা কস্মিন্‌কালেও হইবে না—সত্যবতী সেই কথাই ভাবিতেছিলেন।

অম্বা বলিল—মা! কত বড় পাপ আমি করেছি, এতদিন কিছুতেই তা আমি বুঝতে পারি নি—আজ যেমন পেরেছি। আমার সে পাপের ভরাতেই মাতাপুত্রের আজন্মের প্রীতি বিরোধ-তপ্ত হ'য়ে উঠেছে, এ ত আমি নিজের চোখেই দেখেছি, নিজের কানেই শুনেছি। আমার বাবা যে কেন হঠাৎ বাউল হয়ে দেশ ছেড়েছেন তাও আজ স্পষ্ট হ'য়ে গেছে আমার চোখে!

সত্যবতী তখনও নীরব। সব চেয়ে বিস্ময়ের বিষয় এই যে অম্বার চক্ষু একেবারে স্থির, এতটুকু চঞ্চলতাও সেখানে নাই।

অম্বা মাটিতে বসিয়া পড়িয়া তাঁহার পা দুটি চাপিয়া ধরিয়া বলিল—আপনার কাছে বিদায় আমি চাইব না, কারণ আমি জানি অনেক আগেই আপনি আমাকে বিদায় দিয়েছেন। সে আমি জানি—কিন্তু মা, আমি যা চাই—দিতে আপনার যত কষ্ট হ'ক—না পেলে আমি বাঁচব না।

সত্যবতী কঠোর দৃষ্টি সংযত করিয়া চাহিলেন—বিষম কৌতূহলও দমন করিয়া তিনি অম্বার পানে চাহিয়া রহিলেন।

অম্বা আস্তে আস্তে বলিল—আমার নিজের সর্ব্বনাশকে আমি ভয় করিনে মা। প্রথম যেদিন আজন্মের গৃহের চৌকাট পার হ'য়েছিলুম, কত আশাই না ছিল, কিন্তু মন ত আমার কেঁপে উঠেছিল। সে-যে সব অমঙ্গলই কল্পনা করে' কেঁপে উঠে আমাকে বারণ করেছিল,......

একমুহূর্ত্তের জন্য সত্যবতী অম্বার পূর্ব্বাবস্থা বিস্মৃত হইয়া বলিলেন—অম্বা, মেয়ে মানুষের কাছে ত তুমি গোপন করতে পারবে না, বল্‌তে পার, তোমার মত মেয়ে এমন কাজ ক'রলে কেমন করে?

অম্বা কথা কহিল না। তাহার বিবর্ণ মুখ, পাণ্ডুর চোখ দেখিয়া সত্যবতী বুঝিলেন—নারী হইলেও সে কথা নারীর কাছেও প্রকাশ করা চলে না। এ প্রশ্ন করা যে কতদূর অন্যায় হইয়াছে, তাহাও বুঝিলেন—কিন্তু নারীত্বের জলাঞ্জলি যে কোনমতেই বঙ্গরমণীর সহজসাধ্য নহে ভাবিয়া তাঁহার বিস্ময় বড় অল্প ছিল না।

অম্বা উত্তর না দিলেও তাঁহার দুঃখ হইল না। এইমাত্র তাঁহার হৃদয়ের যে সুউচ্চ পরিচয় সে দিয়াছে, এত কালী মাখিয়াও সে-যদি তাঁহার কাছে দুষ্প্রাপ্য প্রার্থনাও করিত, সত্যবতীর অদেয় ছিল না।

অম্বা তখনও পা দুটির মধ্যে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়াছিল, সত্যবতীর মনে হইল—রমণীহৃদয়ের এ কি অবিচার!

সত্যবতীর বক্ষ যেন হাত বাড়াইয়া অম্বাকে তুলিয়া লইল। তিনি বাষ্পপূর্ণ-কণ্ঠে বলিলেন—অম্বা তোমাকে আমি ক্ষমা করেছি। বলিতে বলিতে তাঁহার স্বর ভাঙ্গিয়া গেল। কণ্ঠ রোধ করিয়া যে জলোচ্ছ্বাস নির্গমের পথ খুঁজিতেছিল, তাহাকে মুক্তি দিতে পারিলেই সুখের হইত, কিন্তু অম্বার সজল মুখের কাতরতায় সত্যবতী বুক বাঁধিয়া বলিলেন—অম্বা তুমিও আমাকে ক্ষমা কর।

অম্বা দীপ্ত সজল নেত্রে চাহিয়া বলিল—অমন কথা বলবেন না মা। আমাকে যে আপনি সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করতে পেরেছেন—এ ত আমার কম ভাগ্য নয়।

তরুণ ঘরের ভিতর জড়ের মত পড়িয়াছিল। হয়ত সে সত্যই অম্বাকে ভালোবাসিয়াছিল। এ-রকম সম্মিলনে ভালোবাসা জন্মে কি-না, জন্মিলেও তাহা কেমন স্থায়ী হয়—এ সকল তর্ক করিতে আমি প্রস্তুত নহি—যাহা ঘটিতেছিল, তাহা এই :—

অম্বার কথাগুলি জ্যানির্মুক্ত শরের মতই তাহার মর্মস্থল বিদ্ধ করিয়া ফেলিতেছিল। প্রত্যেক কথার সঙ্গেই অম্বার হৃৎপিণ্ড-নিঃসৃত রক্তের ঝলকে তাহার হৃদয় মন একেবারে রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছিল! অম্বা অশিক্ষিতা বলিয়াই নিজের পরিচয় দিয়াছে—কিন্তু কোন সুশিক্ষিতা মেয়েও যে এমন যুক্তি তর্কের কথা বলিতে পারে—এ-যে তাহার কল্পনাও স্পর্শ করিতে অক্ষম।

অম্বা যে একটি জীবন্ত প্রহেলিকার মত কোথায় উঠিয়া কোথায় মিলিতে চাহিতেছে, দিশেহারা তরুণ তাহার কোন সন্ধানই করিতে পারিল না।

আজ তাহার কথা শুনিয়া তরুণের হৃদয়ে বিদ্রোহ জাগিয়া উঠিয়াছিল,—তাহাকে সঙ্কীর্ণ মনে বিদায় দেওয়ার চেয়ে মহাপাতক বিশ্বজগতে আর কিছু হইতে পারে না, তাহার হৃদয়-দেবতা এই কথাটি জানাইয়া দিতেই সে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিল।

অম্বা মনের মধ্যে কোন গ্লানি রাখিবে না বলিয়াই ধীরপদে তাহার সম্মুখীন হইয়া বলিল—আপনিও আমাকে বিদায় দিন।

তরুণের শ্বাসরুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। সে একবার সত্যবতীর পানে, একবার অম্বার পানে চাহিয়া, ঘরের মধ্যেই শ্বাস-বাষ্প খুঁজিতে লাগিল।

সত্যবতী প্রস্থান করিতেই অম্বা নত হইয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিল—এত বড় একটা সর্ব্বনাশ পৃথিবীর ইতিহাসে আর দেখতে পাবেন না, তরুণ বাবু!

তরুণ কি বলিতে গেল, অম্বা বলিল—অতবড় শত্রুও আপনাকে দেখলে শত্রুতা ভুলে যায়। আজ একটা অনুরোধ আমার আছে—

তরুণ কেবলমাত্র চাহিল।

অম্বা নতমুখে বলিল—একটা অনুরোধ আমার রাখবেন। আজই আমি যাব—আপনি সে সময়টি থাকবেন না। আপনি থাকলে হয়ত আমি—যেতে পারব না।

বাতাসে সমুদ্রবক্ষ ফুলিয়া উঠিতেছিল, অম্বা যেন তাহা বুঝিয়াই পুনরায় বলিল—আমাকে ভালবেসেছেন, এ অনুরোধ আমার রাখতে ভুলবেন না।—বলিয়া সে গলায় কাপড় দিয়া প্রণাম করিল। দুহাতে তাহার চরণের ধূলি লইয়া প্রথমে মাথায় পরে অধরে স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল।

থিয়েটারের অভিনয় ভাঙ্গিয়া হঠাৎ যবনিকা-পতনে দর্শক যেমন ভাবে দাঁড়াইয়া উঠে, তরুণও তেমনি সোজা হইয়া বলিল—তবু যাবে অম্বা?

আর উপায় নেই—বলিয়া সে স্থিরদৃষ্টিতে তরুণের পানে চাহিল।

তরুণ ক্ষুব্ধস্বরে বলিল—উপায় আছে....

অম্বা বলিল—নেই, তরুণ বাবু, কোথাও কোন উপায় নেই।

তরুণ বলিয়া উঠিল—যদি আমি......

অম্বা দৃঢ় অথচ মৃদুস্বরে বলিল—তাও হয় না, তরুণ বাবু।...

সে নামিয়া যাইতেছিল, তরুণ হাত বাড়াইয়া বলিল—যাবেই ?

অম্বা হাসিল, সেই হাসিই তরুণের চোখে কান্নার মত ঠেকিল,—সে আবার বলিল—তুমি আমার গৃহদেবী...

অম্বা সকাতরে যুগ্মহস্তে ধীরপদে নীচে নামিয়া গেল।

শেষ

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

মূল্যবান্ সংস্করণের মতই—

কাগজ, ছাপা, বাঁধাই—সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।

—আধুনিক শ্রেষ্ঠ লেখকের পুস্তকই প্রকাশিত হয়।—

বঙ্গদেশে যাহা কেহ ভাবেন নাই, আশাও করেন নাই। আমরাই ইহার প্রথম প্রবর্ত্তক। বিলাতকেও হার মানিতে হইয়াছে—সমগ্র ভারতবর্ষে ইহা নূতন সৃষ্টি। বঙ্গসাহিত্যের অধিক প্রচারের আশায় ও যাহাতে সকল শ্রেণীর ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট পুস্তক-পাঠে সমর্থ হন, সেই মহা উদ্দেশ্যে আমরা এই অভিনব 'আট-আনা-সংস্করণ' প্রকাশ করিয়াছি।

মফঃস্বলবাসীদের সুবিধার্থ, নাম রেজেষ্ট্রী করা হয়; গ্রাহকদিগের নিকট নবপ্রকাশিত পুস্তক ভিঃ পিঃ ডাকে প্রেরিত হয়। পূর্ব্ব প্রকাশিতগুলি একত্র, বা পত্র লিখিয়া, সুবিধানুযায়ী, পৃথক্ পৃথকও লইতে পারেন।

ডাকবিভাগের নূতন নিয়মানুসারে মাশুলের হার বর্দ্ধিত হওয়ায়, গ্রাহক-দিগের প্রতি পুস্তক ভিঃ পিঃ ডাকে ৸৶০ লাগিবে। অ গ্রাহকদিগের ৸/০ লাগিবে।

গ্রাহকদিগের কোন বিষয় জানিতে হইলে, "গ্রাহক-নম্বর" সহ পত্র দিতে হইবে।

প্রতি বাঙ্গালা মাসে একখানি নূতন পুস্তক প্রকাশিত হয়;—

১। অভাগী (৬ষ্ঠ সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।

২। ধর্ম্মপাল (৩য় সং)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ।

৩। পল্লীসমাজ (৬ষ্ঠ সং)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৪। কাঞ্চনমালা (২য় সং)—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম-এ।

৫। বিবাহ বিপ্লব (২য় সং)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল।

৬। চিত্রালী (২য় সং)—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি-এ।
৭। দূর্ব্বাদল (২য় সং)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।
৮। শাশ্বত ভিখারী (২য় সং)—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।
৯। বড়বাড়ী—(৫ম সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।
১০। অরক্ষণীয়া (৪র্থ সং)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ।
১১। ময়ূখ (২য় সং)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ।
১২। সত্য ও মিথ্যা (২য় সং)—শ্রীবিপিন চন্দ্র পাল।
১৩। রূপোর বালাই (২য় সং)—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।
১৪। সোণার পদ্ম (২য় সং)—শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৫। চৈতালী (২য় সং)—শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী
১৬। আলেয়া (২য় সংস্করণ)—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।
১৭। বেগম সমরু (সচিত্র)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৮। নকল পাঞ্জাবী (২য় সংস্করণ) শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।
১৯। বিল্বদল (২য় সংস্করণ)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।
২০। হালদার বাড়ী (২য় সং)—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।
২১। মধুপর্ক—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।
২২। লীলার স্বপ্ন—শ্রীমনোমোহন রায়, বি-এ।
২৩। সুখের ঘর (২য় সং)—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, এম-এ।
২৪। মধুমল্লী (২য় সং)—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।
২৫। রসির ডায়েরী—শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী।
২৬। ফুলের তোড়া (২য় সং)—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।
২৭। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
২৮। সীমন্তিনী—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।
২৯। নব্য-বিজ্ঞান—অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ।
৩০। নববর্ষের স্বপ্ন—শ্রীসরলা দেবী।
৩১। নীল মাণিক—রায়সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, বি-এ।

৩২। হিসাবনিকাশ—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল।
৩৩। মায়ের প্রসাদ—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
৩৪। ইংরেজী কাব্যকথা—শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ।
৩৫। জলছবি—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।
৩৬। শয়তানের দান—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।
৩৭। ব্রাহ্মণ-পরিবার—(২য় সংস্করণ) শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।
৩৮। পথে-বিপথে—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি-আই-ই।
৩৯। হরিশ ভাণ্ডারী—(৩য় সংস্করণ) শ্রীজলধর সেন।
৪০। কোন্ পথে—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, এম-এ।
৪১। শ্রীবিলাস—শ্রীগুরুদাস সরকার, এম-এ।
৪২। পল্লীরাণী—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
৪৩। ভবানী—শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।
৪৪। অমিয় উৎস—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।
৪৫। অপরিচিতা—শ্রীপান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ।
৪৬। প্রত্যাবর্ত্তন—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বসুমতী সম্পাদক
৪৭। দ্বিতীয় পক্ষ—শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম-এ, ডি-এল।
৪৮। ছবি (২য় সং)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৪৯। মনোরমা—শ্রীমতী সরসীবালা বসু।
৫০। সুরেশের শিক্ষা—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ।
৫১। নাচওয়ালী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ।
৫২। প্রেমের কথা—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ।
৫৩। গৃহহারা—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৫৪। দেওয়ানজী—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।
৫৫। কাঙ্গালের ঠাকুর—শ্রীজলধর সেন।
৫৬। গৃহদেবী (২য় সংস্করণ)—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।
৫৭। হৈমবতী—শ্রীচন্দ্রশেখর কর।

৫৮। বোঝাপড়া—শ্রীনরেন্দ্র দেব।
৫৯। বৈজ্ঞানিকের বিকৃত বুদ্ধি—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়
৬০। হারান ধন—শ্রীনসীরাম দেবশর্ম্মা।
৬১। গৃহ-কল্যাণী—শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল
৬২। সুরের হাওয়া—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু, বি-এস্ সি।
৬৩। প্রতিভা—শ্রীবরদাকান্ত সেন গুপ্ত।
৬৪। আত্রেয়ী—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত, বি-এল।
৬৫। লেডী ডাক্তার—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, এম-এ।
৬৬। পাপীর কথা—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, এম-এ, পি এইচ-ডি।
৬৭। চতুর্ব্বেদ (সচিত্র)—শ্রীভিক্ষু সুদর্শন।
৬৮। মাতৃহীন—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।
৬৯। মহাশ্বেতা—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
৭০। উত্তরায়ণে গঙ্গাস্নান—শ্রীশরৎকুমারী দেবী।
৭১। প্রতীক্ষা—শ্রীচৈতন্যচরণ বড়াল, বি-এল।
৭২। জীবন-সঙ্গিনী—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
৭৩। দেশের ডাক—শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়
৭৪। বাজীকর—শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।
৭৫। স্বয়ম্বরা—শ্রীবিধুভূষণ বসু।
৭৬। আকাশ কুসুম—শ্রীনিশিকান্ত সেন।
৭৭। বরপণ—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।
৭৮। আহুতি—শ্রীসরসীবালা বসু।
৭৯। ভাঙ্গা—শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী।
৮০। মণ্টুর মা—শ্রীচরণদাস ঘোষ।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।